গীতানুবচন

প্রথম খণ্ড

অনির্বাণ

গীতানুবচন

প্রথম খণ্ড

অনির্বাণ

[মূল্য ঃ চল্লিশ টাকা

Gitanuvachan (Part I) 2nd Edition **By Anirvan**

প্রকাশক ঃ
শ্রীমৎ স্বামী জ্ঞানানন্দ সরস্বতী
আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ
পোঃ হালিসহর, উঃ ২৪ পরগণা

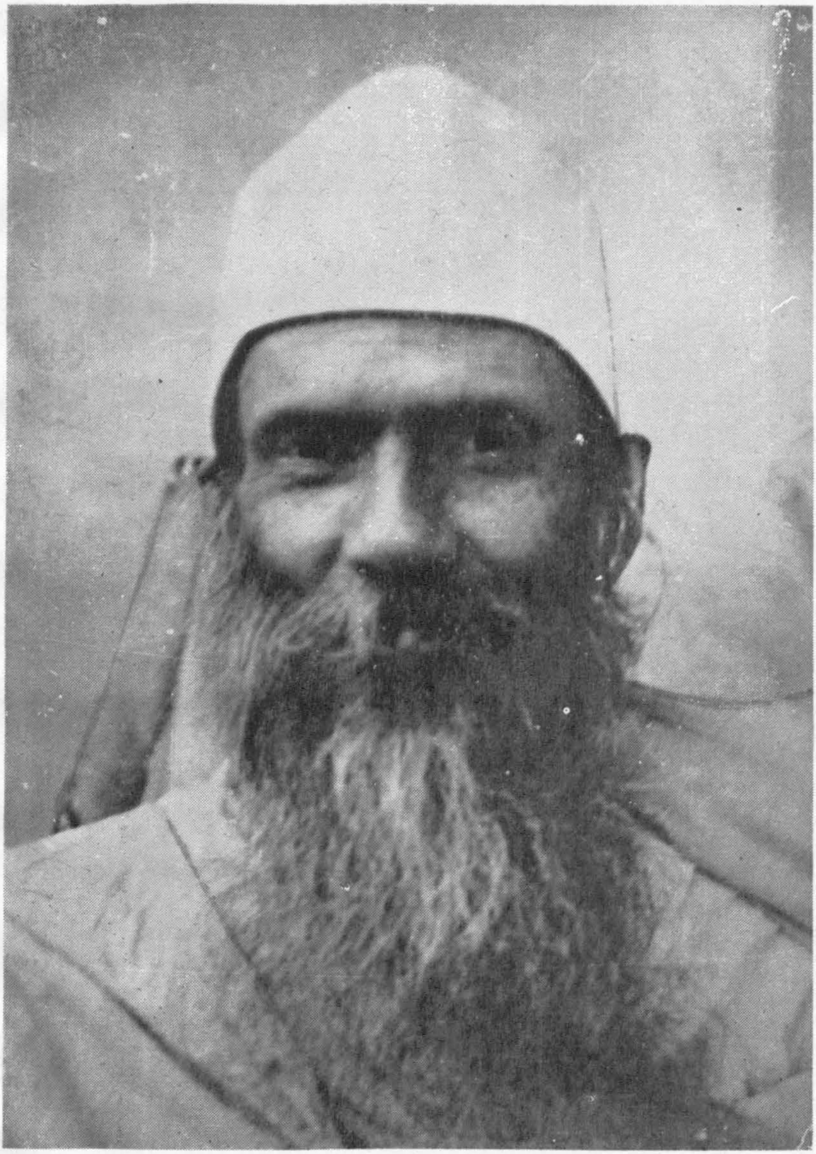
প্রথম সংস্করণ—শ্রীশ্রীগুরু পূর্ণিমা—১৩৭৫
দ্বিতীয় সংস্করণ—১০ই পৌষ (২৫শে ডিসেম্বর) ১৩৮৭
তৃতীয় সংস্করণ—২৯শে পৌষ (১৪ই জানুয়ারি) ১৪১১

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

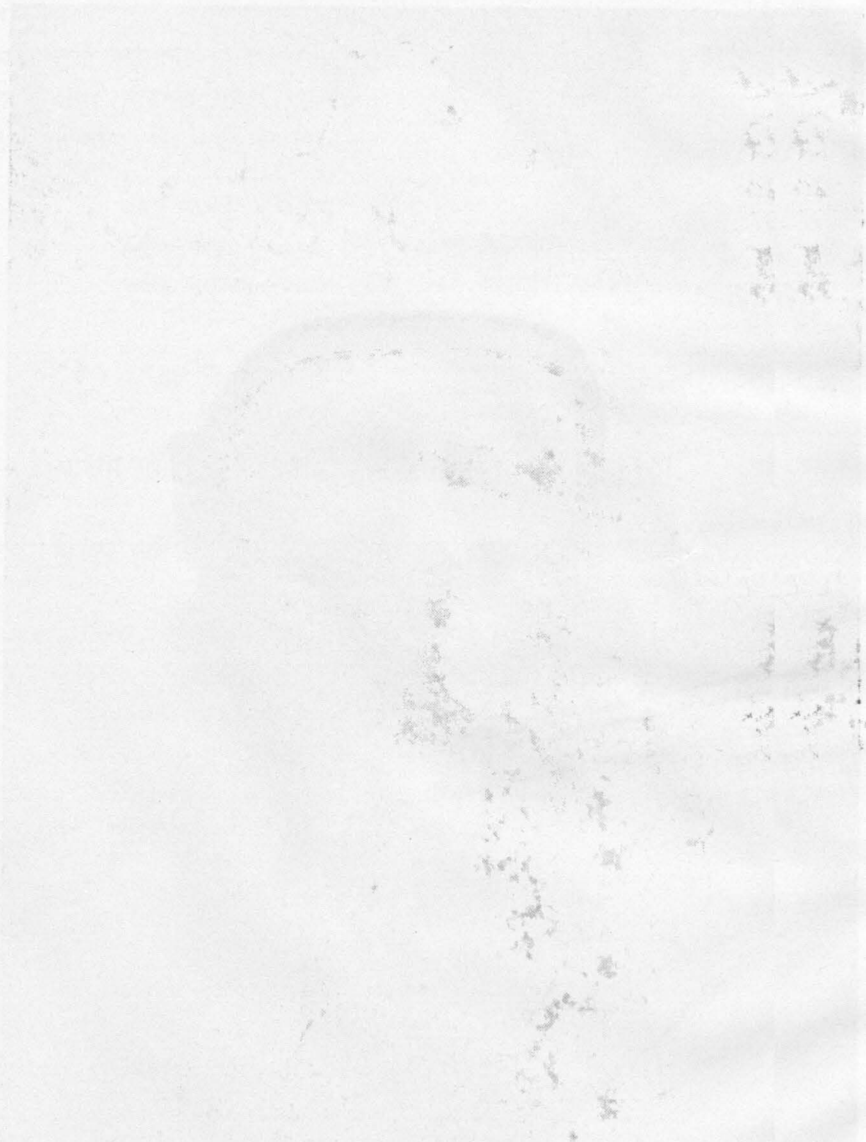
১। আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, হালিসহর, উঃ ২৪ পরগণা
ফোন—২৫৮৫-৮১৬৭/৩১০১
২। মহেশ লাইব্রেরী, ২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, (কলেজ স্কোয়ার)
কলকাতা-৭৩, ফোন—২২৪১-৭৪৭৯
৩। সর্বোদয় বুক ষ্টল, হাওড়া ষ্টেশন, পোঃ ও জেলা হাওড়া।
৪। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

অক্ষরবিন্যাস ঃ
শ্রীঅজিত চৌধুরী
সাধনা প্রেস
৪৫/১এফ, বিডন ষ্ট্রীট, কলকাতা-৬

মুদ্রাকর ঃ
কমলা প্রেস
২০৯এ, বিধান সরণি
কলকাতা-৬



অনির্বাণ



শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু

নিবেদন

গীতাশাস্ত্র সর্বোপনিষদসার। জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাগ্রন্থের প্রণেতা। গীতার স্বরূপ-পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন—'তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্তবেদার্থসারসংগ্রহভূতং দুর্বিজ্ঞেয়ার্থম্।' বেদার্থসার সংগ্রহ করিয়া বিশালবুদ্ধি সর্বজ্ঞ ভগবান্ বেদব্যাস—'ভগবতা যথোপদিষ্টং', সেই ভাবে গীতাশাস্ত্র সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। দুর্বিজ্ঞেয় রহস্যপূর্ণ এই গীতাশাস্ত্রের মর্ম অধিগত করা সহজসাধ্য নহে। ভগবদনুগ্রহ এবং প্রণেতা বেদব্যাসের অনুগ্রহ ব্যতীত গীতারহস্য হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। বৈয়াসকী চেতনায় মন-বুদ্ধির নিমজ্জন ব্যতীত গীতারহস্য আবিষ্কারের আর দ্বিতীয় কোন পন্থা নাই।

বৈদিক পরিভাষার ব্যঞ্জনা এবং রহস্যার্থ সম্পর্কে যিনি অভিজ্ঞ তাঁহার আনুগত্যে গীতার্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার সাধ বহুদিন হইতেই মনে সঙ্গোপিত ছিল। শ্রীগুরুকৃপায় অভিজ্ঞ আচার্যের অনুগ্রহ মিলিয়া গেল। বেদরহস্যবেত্তার পদপ্রান্তে বসিয়া গীতারহস্যের কথা শ্রবণ করিয়া ধন্য হইতেছি। সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় বৈদিক ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন এবং করিতেছেন। বেদার্থসারসংগ্রহভূত গীতাশাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করিবার অধিকার বেদজ্ঞ আচার্যেরই আছে। সৌভাগ্যক্রমে আমি এইরূপ একজন আচার্যেরই কৃপা লাভ করিয়াছি। কোন ভাষ্য বা টীকা-টিপ্পনী দেখিয়া আমি গীতার শ্লোক সম্পর্কে প্রশ্ন করি নাই। স্বভাবত আমার মনে যে প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছে, আচার্যের নিকট তাহাই আমি ব্যক্ত করিয়াছি মাত্র। এই ভাবে প্রশ্নোত্তরীর মাধ্যমে সম্ভব হইয়াছে—গীতানুবচনের। গীতানুবচনের প্রথম খণ্ডে প্রথম ষট্‌কেরই প্রশ্নোত্তর আছে। প্রথম হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত বিশেষ বিশেষ শ্লোক অবলম্বন করিয়া আমি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছি, তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছেন বেদমীমাংসার আচার্য শ্রীমৎ অনির্বাণ।

বেদার্থ সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান অনেকেরই নাই। বেদজ্ঞ আচার্য ব্যতীত বেদার্থসারসংগ্রহভূত গীতাশাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যাও সম্ভবপর নহে। গীতার

সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা অনেক আছে, কিন্তু বৈদিক ভাবনার উজ্জ্বল ছবি অনেক ক্ষেত্রেই পরিদৃষ্ট হয় না। গীতানুবচনের বৈশিষ্ট্য এইখানে। গীতাশাস্ত্রের রহস্য আবিষ্কারে বৈয়াসকী-চেতনার উত্তরাধিকারী শ্রীমৎ অনির্বাণ তাঁহার বিশাল বুদ্ধি ও প্রতিভাকে যথাযথভাবে নিয়োজিত করিয়াছেন। গীতানুবচনে বৈদিক চিন্তাধারার একটা সুস্পষ্ট ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। গীতার মধ্যে মহাভারতের সামগ্রিক চিন্তারই পরিচয় সুপরিস্ফুট।

গীতা, উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মসূত্র নিত্য স্বাধ্যায়গ্রন্থ। উপযুক্ত আচার্যের নিকটই এই গ্রন্থগুলি পাঠ করিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে গীতা এবং উপনিষদ্ সম্পর্কে রহস্যার্থ অবগত হওয়ার সুযোগ মিলিয়াছে। গীতার শ্লোকের মধ্যে এমন এক-একটি পরিভাষা বা শব্দের প্রয়োগ আছে যে, তাহার বৈদিক অর্থ বা ভাবনা পরিজ্ঞাত না হইলে আসল তাৎপর্যই অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত আচার্যের আনুগত্য এক্ষেত্রে অনাবশ্যক। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে, গীতানুবচনের আলোচনা পাঠককে যে বৈদিক যুগের অখণ্ড ভাবনার সঙ্গে সুপরিচিত করিয়া দিবে—ইহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বেদপাঠ সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে; আবার বৈদিক ভাবনার সঙ্গে পরিচিতি না থাকিলে গীতাশাস্ত্র বোঝাও অসম্ভব। বেদের রহস্য আবিষ্কার করিয়া আচার্য শ্রীমৎ অনির্বাণ জনসাধারণের মধ্যে তাহা প্রচার করিতেছেন। অধিকাংশ সময় তিনি বেদের রহস্য আবিষ্কারেই সমাহিত। বেদের অখণ্ড ভাবনাই আজ খণ্ডিত মন-বুদ্ধির সম্মুখে উপস্থাপিত করা একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীগুরু-ভগবানের ইচ্ছা হইলে গীতানুবচনের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ষট্‌কও প্রকাশিত হইবে। আর্য-সংস্কৃতির মূল উৎস—বেদ। গীতার মধ্যে স্থানে স্থানে আমরা সেই বৈদিক ভাবনারই ইঙ্গিত পাই। বিশালবুদ্ধি ব্যাসদেবের ধর্মসূত্র আলোচনাই জগতের পক্ষে আজ একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। মহাভারতের ধর্মালোচনা, গীতার ধর্মালোচনাই আজ সমগ্র বিশ্ব-মানবকে পথ দেখাইবে। যে বলিষ্ঠ সমুন্নত চেতনায় মহা-ভারতের সৃষ্টি, আজ আমাদিগকে সেই সম্যক্ দৃষ্টিই লাভ করিতে হইবে। বেদব্যাসের ভাগবতী প্রতিভাই আজ সমগ্র জগতের পথপ্রদর্শক হইবে। বিশাল বুদ্ধি এবং সামগ্রিক দৃষ্টি লইয়াই আজ শ্রীমৎ অনির্বাণও বেদ-রহস্য-কথা জনসাধারণে প্রচার করিতেছেন। মহাভারতের বলিষ্ঠ, সমুন্নত, স্বাস্থ্যপ্রদ চিন্তাই আজ

জগতের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। কর্মসন্ন্যাস নহে, কর্মযোগই বৈদিক সভ্যতার বিশেষত্ব। শতবর্ষ পরমায়ু লইয়া বীরসাধকের মত জগৎকে সম্ভোগ করাই বৈদিক আদর্শ। দিব্যজীবন এবং বৈবস্বত মৃত্যু উভয়ই তুল্যমূল্য। বৈদিক আদর্শের মধ্যে আমরা বাঁচার মত বাঁচা এবং বীরের মত মৃত্যুবরণের ইঙ্গিতই পাই। গীতাশাস্ত্র বৈদিক চিন্তারই অবশিষ্ট। জীবন-মরণের উল্লাসই গীতা। গীতানুবচনে—বৈদিক আচার্যের উপদেশে আমরা আবার সেই বিশালবুদ্ধি ব্যাসদেবের অখণ্ড ভাবনারই ইঙ্গিত পাই।

নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ
প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ॥

ঋতম্ভরা
৫২, ঠাকুরবাটী ষ্ট্রীট
পোঃ—শ্রীরামপুর, জিলা হুগলী

স্বামী সত্যানন্দ

মুখবন্ধ

গীতানুবচনের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল

গীতার এই অদ্বিতীয় ভাষ্য মহারাজ শ্রীঅনির্বাণের লেখনী হতেই সম্ভব। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী গীতা, আর পুরুষোত্তম শ্রীঅনির্বাণের লেখনীপ্রসূত গীতাভাষ্য গীতানুবচন।

শ্রীভগবান অর্জুনকে উপদেশ প্রদান করে অবশেষে বললেন—

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাৎ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥

—গুহ্য হতে গুহ্যতর জ্ঞানের কথা তোমায় বললাম, এখন সব দিক বিচার করে তোমার যা ইচ্ছা হয় তাই-ই কর। গীতানুবচন প্রথম খণ্ডের শেষে এরই প্রতিধ্বনি শুনি। শ্রীমৎ অনির্বাণ স্বামীজীকে বলছেন—আমার দৃষ্টি তোমায় দিলাম, এখন তুমি যেমন খুসী দেখ।

গীতানুবচন যে নতুন আভরণে, নতুন সজ্জায় সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হল—তার জন্য হৈমবতী-অনির্বাণ ট্রাস্টের সদস্যরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাঁদের আমার আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা জানাই।

প্রার্থনা করি—শ্রীঅনির্বাণ-সত্যানন্দের এই হৃৎকর্ণরসায়ন সংবাদ সবার হৃদয়ে দিব্যানুভবের সঞ্চার করুক।

ঋতম্ভরা
৫২, ঠাকুরবাটী ষ্ট্রীট
শ্রীরামপুর, হুগলী

প্রকাশক

গীতানুবচন

প্রশ্ন

গীতাধ্যানে 'গীতাকে 'অম্ব' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। 'ভগবদ্দগীতে' 'অম্ব' এই সম্বোধনের তাৎপর্য কি? গীতাকে মায়ের সঙ্গে, 'Mother'এর সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে কেন?

উত্তর

গীতাকে উপনিষদ্ বলা হয়। 'উপনিষদ্ শ্রুতির অন্তর্গত। শ্রুতি দেবী বাক্। তিনি সরস্বতীও। বেদে এই সরস্বতীকে 'অম্বিতমে' বলে সম্বোধন করা হয়েছে, তাঁর মাতৃমূর্তির অতি মধুর বর্ণনা সেখানে আছে। এই সব অনুষঙ্গে শ্রুতিকে 'মাতা' বলা হয়। গীতাও তাই অম্বা বা মাতা।

প্রশ্ন

আসল নামটা শ্রীমদ্ভগবদ্দগীত, না, শ্রীমদ্ভগবদ্দগীতা? Divine Song of the Lord হইলে তো 'গীত'ই হওয়ার কথা। সুর করিয়া যাহা গাওয়া হয় তা-ই তো গীত? তাহা হইলে সামগানের মত গীতাও কি গেয়? উপনিষৎ শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ হওয়াতেই কি 'শ্রীমদ্ভগবদ্দগীতাসু' হইয়াছে? আরেকটি কথা, প্রতি অধ্যায়ের শেষেই আছে 'শ্রীমদ্ভগবদ্দগীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগ-শাস্ত্রে'……ইত্যাদি। গীতাকে উপনিষৎ, ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগশাস্ত্র বলা হইয়াছে কেন?

উত্তর

সংজ্ঞাটি 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'—উপনিষৎ-এর বিশেষণ। ভগবান্ যখন উপদেশ দেন, তখন গান করে-ক'রে দিয়েছিলেন একথা মনে হয় না। তিনি গদ্যেই বলেছিলেন ব'লে মনে হয়। তাঁর উপদেশ গ্রথিত হবার সময় তাকে কাব্যরূপ দেওয়া হয়। গীতা মূলত

ভাগবতদের শাস্ত্র। ভাগবতরা ভগবান্‌কে গান বা কীর্তনের দ্বারা ভজনা করতেন, বেদ থেকেও তা প্রমাণ করা যেতে পারে। গীতাতেও সতত কীর্তনের কথা আছে (৯।১৪)। ভগবানের অনুশাসন গ্রথিত হয়ে 'গাথা' আকার পেল, সেগুলি তখন গাওয়া হত। ভক্তেরাই গাইতেন ; ক্রমে ভগবদ্‌বচন ভগবানের দ্বারাই গীত—এইরকম একটা ধারণা হয়ে যায়। অধ্যাত্ম উপদেশ শ্লোকাকারে নিবদ্ধ হওয়ার রেওয়াজ খুব প্রাচীন, রেওয়াজটি মধ্যযুগ পর্যন্ত চলে এসেছে। সুতরাং ভগবান্ যে গাথায় উপদেশ করবেন, সেটা অসম্ভব বা আশ্চর্য কিছুই নয়। কিন্তু কুরুক্ষেত্রে বসে কৃষ্ণার্জ্জুন কথাবার্ত্তা চালিয়েছেন পদ্যে, এটা কষ্টকল্পনা।

গীতা বস্তুত ইতিহাসের অন্তর্গত। রামায়ণ-মহাভারত ইতিহাস। ইতিহাস-পুরাণ পঞ্চম বেদ। সুতরাং তার কোনও বিশিষ্ট অংশ উপনিষদ্ বলে গণ্য হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই। ভাগবতরা জনসাধারণের অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের কাছে বাসুদেবের মুখের বাণীই বেদ' অতএব উপনিষদ্। উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাই প্রতিপাদিত হয়েছে। অতএব গীতাও ব্রহ্মবিদ্যা। কিন্তু গীতা শুধু তত্ত্বের উপদেশই করেননি, কি ক'রে সে-তত্ত্বকে সাধনার দ্বারা জীবনে সিদ্ধ করা যায়, তার উপদেশও দিয়েছেন। সাধন-পদ্ধতি মাত্রই যোগ—এমন একটা ভাবনা গীতায় পাই। ওর প্রত্যেকটি অধ্যায় যোগ। তাইতে গীতা একাধারে বিদ্যা (= সাংখ্য) ও যোগ-এর শাস্ত্র।

প্রশ্ন

কুরুক্ষেত্র মহাসমরে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতা উপদেশ দিয়াছিলেন যুদ্ধের পূর্ব্বে। যুদ্ধে অর্থাৎ স্বধর্মে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই তো গীতার উপদেশ? যুদ্ধ বন্ধ রাখিয়া অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা কীর্তন করা হইয়াছিল কি? যুদ্ধকে অবলম্বন করিয়াই তো গীতার উপদেশ? অনেকের মতে কুরুক্ষেত্র-মহাসমর ঐতিহাসিক নয়। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার প্রাধান্যই অনেকে দিয়া থাকেন। নিগূঢ় রহস্য কি?

উত্তর

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকে অনৈতিহাসিক বলবার কোনও সঙ্গত কারণ দেখি না। ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য দেশের মত ইতিহাস লেখা হয়নি, সুতরাং তার সবকিছুই আষাঢ়ে গল্প—পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এ-মত তাঁরাও আজকাল আর জোরের সঙ্গে প্রচার করেন না। শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কুরুক্ষেত্রের সময়-নির্দেশ মহাভারতেই আছে এবং তা নিয়ে অনেক গবেষণাও হয়েছে। মনে হয়, খৃঃ পূঃ ১৪০০'র কাছাকাছি এই যুদ্ধ হয়েছিল। যাঁরা বেদের কালকে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে নামিয়ে আন্‌তে চান, তাঁদের পক্ষে এই কাল-নির্দেশ মেনে নেওয়ার কিছু অসুবিধা আছে। কিন্তু তাঁদের আপত্তি ক্রমে নির্জীব হয়ে আসছে।

অর্জুনের মোহ, আর শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা মোহ-অপনোদন—এ-দুটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। তবে গীতা এখন যে-আকারে পাই, আদিতে সে-আকার ছিল কি-না বলা কঠিন। Otto সাহেব তাই 'The Original Gita'র সন্ধান করেছেন। গীতা যে-ভাষায় নিবদ্ধ হয়েছে, তা মৌলিক না হ'ক, তার ভাব মৌলিক, তা ছান্দোগ্য-উপনিষদের প্রমাণে বোঝা যায়। জীবনটাকে যজ্ঞ বলে মনে করা এবং 'অপিপাস' হওয়া—এ-দুটি গীতার মূল কথা। গীতায় যে-ভাবে কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় করা হয়েছে, সেটি ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনার ইতিহাসে একেবারেই অনন্য। বিশেষ-কোনও ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছাড়া ওটি হতে পারে না। ইতিহাস-পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের যে-পরিচয় পাই, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তাতে সর্বত্র একটি জীবন-দর্শনের মূল কাঠামোকে অনুসরণ করা হয়েছে। এতখানি সঙ্গতি কখনও আকস্মিক হতে পারে না।

অতএব গীতার শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর অনুশাসন দুই-ই সত্য হওয়ার পক্ষে কোনও বাধা নাই।

যুদ্ধের আগে গীতা কীর্তন করা হয়েছিল, যুদ্ধ বন্ধ রাখবার কথা সেখানে ওঠে না। কয়েক-দণ্ডের অনুশাসনে একজন আত্মীয় এবং সমধর্মা পুরুষকে কোনও মহাপুরুষ প্রকৃতিস্থ করবেন—এটা আশ্চর্যের কিছুই নয়।

এদেশে ইতিহাস-রচনার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। মানুষের জীবনে এমন-কিছু যদি ঘটে, যা কোনও বিশ্বজনীন সত্যের প্রকাশ, তাহলে সেই ব্যক্তির জীবন-কথা এবং অনুভবকেই ইতিহাসের অন্তর্গত করা হত। অন্যত্র শুধু বংশানুক্রমে একটা নামের তালিকা দেওয়া ছাড়া আর বিশেষ-কিছু করা হত না। এতে ইতিহাস-পুরাণ লোকশিক্ষার বাহন হয়ে বেদের মর্যাদা লাভ করত। মনে হয়, ইতিহাসকে এমনি করে আদর্শ-জীবনের দিশারী করাতেই ইতিহাস-রচনার সার্থকতা।

ক্রমে ঘটনাকে একটা উপলক্ষ্য বলে মনে হয়, তত্ত্বকথাই প্রধান হয়ে পড়ে। দার্শনিকরা তখন 'আখ্যায়িকা বিদ্যাস্তুত্যর্থা' বলে পাশ কাটিয়ে যেতে চান। সেটা অন্যায়। মানুষের জীবনেই সত্যের জ্বলন্ত প্রকাশ হয়। তা একদিকে যেমন ঘটনা, আরেকদিকে তেমনি তত্ত্ব। দুয়ের ভারসাম্য বজায় রেখে ব্যাখ্যা করতে পারলেই ইতিহাস-পুরাণের আলোচনা সার্থক হয়। মানুষের জীবন তখন হয় উপস্থাপিত তত্ত্বের দৃষ্টান্তস্থল।

প্রশ্ন

গীতার ধ্যানমন্ত্রে গীতাকে 'অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী' বলা হইয়াছে—ইহার নিগূঢ় রহস্য কি?

উত্তর

গীতার আদি মধ্য ও অন্ত—সর্বত্রই অদ্বৈত-তত্ত্বের উপস্থাপনা। অর্জুনের কাছে প্রথমেই দেখা দিল জীবনের একটা অতি-পরিচিত সমস্যা—প্রিয়জনের মৃত্যুকে আমরা কিভাবে গ্রহণ করব। শ্রীকৃষ্ণ তার সমাধান করলেন অদ্বৈত-তত্ত্ব দিয়ে। বললেন, 'অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।' জীবন-মৃত্যু চৈতন্যসমুদ্রে একটা

বুদ্‌বুদের ফুটে উঠে মিলিয়ে যাওয়ার মত। বুদ্‌বুদ চলে যায়, কিন্তু সমুদ্র থাকে। যদি সমুদ্র-ভাবনায় নিজেকে তন্ময় করতে পার, মৃত্যু মোহ বা শোকের কারণ হবে না।

এই থেকে অবিনাশী আত্মতত্ত্বের সন্ধান পেলাম। গীতার মাঝখানটায় যেখানে শ্রীকৃষ্ণ আত্মপরিচয় দিচ্ছেন, সেখানেও নিজেকে প্রকাশ করছেন এক সর্বাবগাহী পরম-তত্ত্বরূপে—অক্ষর-ব্রহ্মরূপে, কালরূপে, বিচিত্র-বিভূতিতে প্রকট পুরুষরূপে, আমাদের প্রাণারাম আরাধ্য দেবতারূপে। বললেন যে যে-ভাবেই উপাসনা করুক না কেন, সে সেই এক-এরই উপাসনা করে।

এইখানে একেশ্বরবাদের সন্ধান পেলাম। অষ্টাদশ অধ্যায়ে আবার স্পষ্ট করে ঘোষণা করলেন, 'যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্। স্বকর্মণাং তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥' (৪৬) আবার পাচ্ছি সেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রয়োগ—জীবনে। সমস্ত জীবনটাই তাঁর পূজা (অথবা যজ্ঞ, যা-ই বল না কেন) তিনি সবকিছু ছেয়ে রয়েছেন, যাঁর থেকে জীবের প্রবৃত্তির উল্লাস।

এমনি ক'রে গীতা আদিতে মধ্যে এবং অন্তে এক অদ্বৈত-তত্ত্বের উপদেশ করেছেন।

মেঘ বর্ষণ করে। এই কালো মেঘটিও বর্ষণ করেছেন—অমৃত। মেঘটি কালো, কেননা তিনি আদিত্যের শুক্ল ভাতিকে ছাপিয়ে সেই 'নীলং পরঃকৃষ্ণম্'—যার মধ্যে জীবন-মরণ সব হারিয়ে যায়। এই মেঘের অমৃতবর্ষণে ত্রিতাপতপ্ত জীবন জুড়িয়ে যায়, বন্ধ্য জীবন শ্যামল হয়।

পতঞ্জলি সম্প্রজ্ঞাত-যোগকে ধর্মমেঘ বলেছেন। এই যোগে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি যেন লোকোত্তর ধর্মের বর্ষণে নিত্য অভিষিক্ত থাকেন। এখানে সেই ধ্বনিও আছে।

প্রশ্ন

বিষাদ-যোগ হইতে মোক্ষ-যোগ পর্যন্ত গীতার অধ্যায়-বিন্যাসের তাৎপর্য কি?

উত্তর

গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে নিজেকে অর্জুনের চেতনায় পরিস্ফুট করে তুলছেন। এইজন্য আলোচনার সময় সর্বদা Contextটিকে স্মরণে রাখা উচিত।

বিষাদ-যোগে জীব জিজ্ঞাসু। জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে—মৃত্যুর সমস্যা। মৃত্যুকে পার হব কী করে, এই কথাটাই নাট্যীয় হয়ে দেখা দিয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তার সম্পূর্ণ জবাব—আত্মদর্শনের দিক থেকে। ব্রহ্মনির্বাণ আর ব্রাহ্মী স্থিতি, দুয়েরই কথা সেখানে বলা হয়েছে। এই অধ্যায়টিই গীতার মর্মরহস্য। অন্য অধ্যায় তারই বিস্তার।

তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় অধ্যায়েরই পরিশেষরূপে কর্মসাধনার সঙ্কেত বলা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে কর্ম আর জ্ঞানের সমন্বয়ের কথা। প্রসঙ্গক্রমে অবতার-তত্ত্ব। এটি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে যা আভাসে বলা হয়েছে, নবম অধ্যায়ে তা আরও স্পষ্ট হবে ক্রমে।

পঞ্চম অধ্যায়ে কর্মযোগ আর জ্ঞানযোগের পর্যবসান যে ভক্তিতে বা ভগবদ্‌বুদ্ধিতে, তার আভাস দেওয়া হল।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগসাধনার ক্রিয়াত্মক উপদেশ। এই পর্যন্ত প্রথম ষট্‌ক। তার মূল প্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞান, কেননা নিজেকে না জানলে ব্রহ্ম হওয়া যায় না। এই ষট্‌কে ব্রহ্ম বা ভগবানের কথা তিনি খুবই কম বলেছেন। মূল বক্তব্য হচ্ছে সাংখ্য বা জ্ঞানযোগ—তাও কর্মবিরহিত নয়। অনেকে এই পথেই কৃতকার্য হন; সুতরাং অর্জুনের জিজ্ঞাসা এখানেই সমাপ্ত হতে পারত।

হয়নি। বিনা জিজ্ঞাসায় কৃপা করে তিনি তাঁর সম্বন্ধে সমগ্র জ্ঞান দিতে উদ্যত হলেন সপ্তম অধ্যায়ে। নিজেকে জানার পর তাঁকে জানা—সাধনা আরও গভীর হল। নিজেকে জানা জ্ঞান, তাঁকে জানা বিজ্ঞান, সপ্তম অধ্যায়ে তারই ভূমিকা।

তাঁকে জানতে হলে জগৎ-রহস্য জানতে হবে। সাতটি মহারহস্য আছে, অষ্টম অধ্যায়ে তারই বিবৃতি। বিশেষ করে জানতে হবে মৃত্যু-রহস্য। তার কথা খুব বিস্তার করেই বলা হয়েছে। মৃত্যু দীপ-নির্বাণ নয়, তাঁতে লয়। এইটি লক্ষ্য করতে হবে।

নবম অধ্যায়টি গীতায় সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। যখন জীবন-মরণের, বিশ্বজগতের সব রহস্য জানলাম, তখন জানতে পারব বিগ্রহধারী তিনি কে। যিনি অবতারে 'মানুষী তনু আশ্রিত' তাঁর স্বরূপ কি। এই জানাই পরম বিজ্ঞান। এই অধ্যায়ে তিনি সেই রাজগুহ্যের কথা বলে নিজেকে প্রকট করলেন। এরপর থেকে জানতে হবে গীতার প্রত্যেকটি কথা এখন সবিগ্রহ ঈশ্বরের বাঙ্‌ময় উদ্‌ভাস।

এই বোধকে স্পষ্ট করবার জন্য দশম অধ্যায়ে বিভূতি-যোগ —সর্বত্র তাঁকে মূর্তরূপে অনুভবের সঙ্কেত। তারই বস্তুনিষ্ঠ সম্প্রত্যয় একাদশ অধ্যায়ের বিশ্বরূপদর্শনে। তবে বিশ্বরূপকে অর্জুন দেখলেন কালরূপে, মৃত্যুরূপে—কুরুক্ষেত্রের পটভূমিকায় বৃন্দাবন এখানে উহ্য।

বিশ্বরূপকে দেখলে, মানুষী তনুর মাঝে পরমকে উপলব্ধি করলে তবে ভক্তি সম্ভব। এই ভক্তি আত্মজ্ঞানের পূর্ণতা। দ্বাদশাধ্যায়ে দ্বিতীয় ষট্‌ক শেষ হল। নিজেকে জানা আর তাঁকে জানা হল।

এখানেও জিজ্ঞাসার শেষ। কিন্তু তিনি আবার বিনা জিজ্ঞাসায় কৃপা করে দিচ্ছেন জগৎ-জ্ঞান। এই জ্ঞানের ভিত্তি কিন্তু বিশ্বরূপ-দর্শন। সাধক বিশ্বচেতনায় প্রতিষ্ঠিত। সেই ভূমি থেকে দেখছেন—প্রকৃতি-পুরুষ, গুণত্রয়, দেবাসুরের লীলা, জগতের বৈচিত্র্য (১৮ অঃ) ইত্যাদি সব। এই দেখার মধ্যবিন্দু হল পুরুষোত্তম-তত্ত্ব। মোটামুটি এই হল গীতার অধ্যায়-বিন্যাসের তাৎপর্য।

প্রশ্ন

গীতায় তিনটি ষট্‌ক রহিয়াছে—কর্ম ভক্তি জ্ঞান। অনেকে বলেন, গীতাশাস্ত্র ভক্তিশাস্ত্র; কেউ বলেন, জ্ঞানশাস্ত্র; কেউ বলেন, কর্মযোগশাস্ত্র।

গীতা কি সমন্বয়শাস্ত্র নহে? গীতার প্রারম্ভ এবং শেষ কোথায়—জ্ঞানে, ভক্তিতে, না কর্মে?

গীতা সত্যি সমন্বয়-শাস্ত্র এবং এদিক দিয়ে গীতা অধ্যাত্মশাস্ত্রের মধ্যে অনুপম। দুঃখের বিষয়, আজ সাড়ে তিন হাজার বছরেও গীতার শিক্ষাকে আমরা জীবনে রূপ দিতে পারলাম না।

সমস্ত জীবনটাই একটা যজ্ঞ বা যোগ—এই হল গীতার পরম ঘোষণা। প্রাচীনকাল থেকেই যজ্ঞকে 'কর্ম' বলা হত। অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশ্যে যা-কিছু করা যায়, যার মূল ভাবটা হল ত্যাগ বা উৎসর্গ-বুদ্ধি, তা-ই যজ্ঞ এবং তা-ই যথার্থ কর্ম। যেখানে ত্যাগ নাই, দেবতা নাই, মানুষের চেতনার উধ্বায়নের কোনও ইশারাই নাই, সেখানে কর্ম গীতার ভাষাতেই 'বিকর্ম'।

কর্ম-সন্ন্যাস এবং তার ফলে জ্ঞান—এমন একটা মত গীতার সময় প্রচলিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাকে আমল দেননি। আবার যজ্ঞের নামে ভোগৈশ্বর্যের লোভে ক্রিয়াবিশেষবাহুল্যের অনুষ্ঠানকেও কশাঘাত করেছেন। তাঁর মতে যোগস্থ হয়ে কর্ম করাই জীবনের আদি লক্ষ্য এবং অন্তিম সিদ্ধি।

জীবন কর্ম দিয়েই শুরু হয়। গীতার অনুশাসনও শুরু হয়েছে কুরুক্ষেত্রে ঘোর কর্মের প্রারম্ভে। কর্ম করতেই হবে—যার যা নিয়ত কর্ম। কিন্তু করতে হবে ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হয়ে এবং নির্দ্বন্দ্ব হয়ে। এই থেকে জ্ঞানের উদয় হবে। আমি বুঝতে পারব, জগতে যা ঘটবার তা প্রকৃতির প্রেরণাতেই ঘটছে, তাকে এড়িয়ে যাবার উপায় নাই, আবার তা'তে জড়িয়ে পড়েও লাভ নাই। এই বুদ্ধি জাগলে মানুষের চিত্ত প্রসন্ন হয়। তখন রাগ-দ্বেষবিমুক্ত হয়ে ভোগ এবং অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা সহজ হয়। নিজেকে তখন অনুভব হয় অকর্তা বলে।

এমনি করে কর্মের পর জ্ঞান। জ্ঞানে চেতনার প্রসার ঘটে। তখন প্রকৃতির কর্মের প্রেরণার পিছনে ঈশ্বরের প্রচোদনাকে

আমরা অনুভব করি। নিজেকে তখন মনে হয় তাঁর নিমিত্ত বলে। তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র—এই বুদ্ধি ভক্তির অনুকূল।

এমনি করে প্রথমে কর্ম, তারপর জ্ঞানে সমস্ত কর্মের পরিসমাপ্তি এবং অবশেষে ভক্তিতে এবং অর্চনাবুদ্ধিতে কর্ম ক'রে কর্মের পূর্ণতা সাধন—এই হল গীতার জীবন-দর্শন।

প্রশ্ন

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুনকে ভগবান্ 'অনার্যজুষ্টম্' বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছেন। আর্যের সংজ্ঞা কি, অনার্যেরই-বা কি? এ-সম্পর্কে আলোক-সম্পাত করুন।

উত্তর

বেদের এক জায়গায় আর্যের এই লক্ষণ পাওয়া যায়—'আর্যা জ্যোতিরগ্রাঃ'—তাঁরাই আর্য, জ্যোতি যাঁদের দিশারী। সুতরাং যাঁরা জ্যোতিরুপাসক, তাঁরাই আর্য। জ্যোতি বলতে আর্যেরা বুঝতেন বাইরে আদিত্যজ্যোতি আর অন্তরে বৃহজ্জ্যোতি, যা থেকে পরে আমরা পেয়েছি ব্রহ্মজ্যোতি। আর্যের বিপরীত হল 'দাস' বা 'দস্যু'। দুটি সংজ্ঞার মূলে আছে 'দস্' ধাতু, যার অর্থ হচ্ছে 'উজাড় করে দেওয়া'। দাসকে কোথাও-কোথাও 'অধরবর্ণ' বা 'কৃষ্ণত্বচ্' বলা হয়েছে। এটি তামসিকতার প্রতীক। তেমনি দস্যুদের হানা দেওয়ার কথাও আছে। এটি বোঝাচ্ছে রাজসিক স্বভাবকে। ফলিতার্থ এই দাঁড়াচ্ছে—আর্য শুদ্ধসত্ত্ব, দস্যু রাজস আর দাস তামস-প্রকৃতির। এই শেষোক্ত দুটি প্রকৃতিই অনার্য। অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে এদের 'বৃত্র' বা অবিদ্যাশক্তিও বলা হয়েছে।

প্রশ্ন

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকটির (২।৭) **'কার্পণ্যদোষ'** কথাটির তাৎপর্য কি? কৃপণ শব্দটি তো উপনিষদে আত্মাকে না জানিয়া যাহারা জগৎ হইতে চলিয়া যায়, তাহাদের লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে? শিষ্যের পর

আবার '**প্রপন্ন**' শব্দটির প্রয়োগ কেন? অর্জুনের ধর্মসংমূঢ় ভাব কি জীবচিত্তের স্বাভাবিক লক্ষণ? প্রত্যেক মানুষেরই কি জীবনে এমন একটা অবস্থা আসে, যেখানে নিজের শ্রেয়ঃ নির্বাচনের ক্ষমতা থাকে না? অর্জুন তো নিজের ভিতরের অন্তর্যামীর নিকট হইতেও নির্দেশ পাইতে পারিতেন? গীতায় তো দেখিতে পাইতেছি, গোড়াতেই **গুরুবাদ** আসল ভিত্তি।

উত্তর

'কৃপ্‌' ধাতু থেকে 'কৃপণ', তা থেকে কার্পণ্য'। ধাতুটির প্রাচীন অর্থ বিলাপ করা। যে বিলাপ করে সে কৃপণ, সে শোকাচ্ছন্ন, তাই শোকও 'কার্পণ্য'। শব্দটি দৈন্যও বোঝায়। গীতায় আছে, 'কৃপণাঃ ফলহেতবঃ' (২।৪৯)। অর্থ, ফলাকাঙ্ক্ষাকে যে কর্মের হেতু বা প্রয়োজক মনে করে সে কৃপণ, কিনা তার বুদ্ধির দৈন্য আছে। শোক আর মোহ যথাক্রমে চিত্তে জ্বালা ধরিয়ে দেয়, আর তাকে আচ্ছন্ন করে। এ-দুটি রজোগুণ আর তমোগুণের ক্রিয়া। ওতে স্বভাব উপহত কিনা পঙ্গু হয়ে থাকে, আপন মহিমায় ফুটতে পারে না। এই শোক আর মোহকেই এখানে বলা হয়েছে কার্পণ্যদোষ।

যে অনুশাসন মেনে চলতে প্রস্তুত, সে 'শিষ্য' কিনা অনুশাসনযোগ্য। শিষ্য প্রধানত 'বিধেয়', অর্থাৎ আজ্ঞাবহ। 'অবিচারে করি আদেশ পালন'—এটা হৃদয়কে তটস্থ রেখেও করা যেতে পারে। প্রপত্তি বা শরণাগতি আরও গভীরের ধর্ম। বুদ্ধি আর হৃদয় দুই-ই না দিতে পারলে প্রপত্তি বা শরণাগতি বা আত্মনিবেদন সার্থক হয় না। শিষ্যমাত্রেই যে প্রপন্ন, তা তো নয়।

ধর্মসম্মোহ জীবের পক্ষে স্বাভাবিক। 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্'—তাকে সাক্ষাৎ করা সহজ নয়। তার জন্যও দীর্ঘদিনের অনুশীলন প্রয়োজন। তাই ধর্মসম্পর্কে সম্মোহ বা সংশয় সবার জীবনেই আসে, বিশেষত যখন জাতিধর্ম বা কুলধর্ম—এক কথায় প্রথাগত সামাজিক ধর্মের সঙ্গে অন্তরের শাশ্বত ধর্মের বিরোধ দেখা দেয়। কি শ্রেয় তা নিঃসংশয়ে বোঝা যায় একমাত্র অন্তর্যামীর

নির্দেশে। সে-নির্দেশ আবার বুঝতে পারা যায়, অন্তরাত্মা প্রসন্ন হলে। তিনি যখন বুদ্ধির দীপ হৃদয়ে জ্বালিয়ে দেন, তখনই। তখন আমাতে আর তাঁতে ভেদ থাকে না।

বাইরের অনুশাসন গৌণ—মন্দাধিকারীর বেলায় তার প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিযুক্ত হলে তার প্রয়োজন থাকে না। রামকৃষ্ণদেবের ভাষায় 'তখন ভিতর থেকে কেউ বলে দেয় এরপর এই—এই।'

মানুষ সামাজিক জীব, তার সমস্ত চরিত্র ও সংস্কার শিক্ষার ফল। সুতরাং জন্মেই সে যে-কোনও প্রকারেই হ'ক, শিক্ষকের অধীন। অতএব একদিক দিয়ে দেখতে গেলে গুরুবাদ একটা সার্বভৌম সত্য। কিন্তু মানুষ শেখে যেমন বাইরের অনুশাসনে, তেমনি আবার ভিতরের প্রেরণাতেও। বাইরে শাস্তা আর ভিতরের অন্তর্যামী—দুই-ই গুরু। তার মধ্যে শাস্তার চাইতে অন্তর্যামী আরও অন্তরঙ্গ। তিনিই সদ্‌গুরু। শাস্তারও কর্তব্য, শিষ্যের মধ্যে অন্তর্যামীকেই প্রবুদ্ধ করা, তাঁর আলোতে পথ চলতে শেখানো। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তা-ই করেছেন। আঠার অধ্যায় শেষ ক'রে অর্জুনকে বলেছেন, 'আমার যা বলবার তা বললাম, এখন "যথেচ্ছসি তথা কুরু"।' আজকাল ক'জন গুরু তা বলতে পারেন?

প্রশ্ন

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনত্রিশ শ্লোকটির (২।২৯) রহস্যার্থ কি? 'আশ্চর্য' পরিভাষাটির তাৎপর্য কি? 'শ্রুত্বা অপি এনং ন বেদ'—ইহার কারণ কি? বেদে 'আশ্চর্য' শব্দটি আছে কি? কি অর্থে 'আশ্চর্য' শব্দটির ব্যবহার হইত?

উত্তর

'আশ্চর্য' শব্দটি বেদে নাই, এমন কি, প্রাচীন উপনিষদেও নাই। এর প্রথম ব্যবহার কঠোপনিষদে। গীতার এই শ্লোকটি সেখান থেকেই নেওয়া। কিন্তু পাণিনিতে 'আশ্চর্যমদ্ভুতে' বলে একটি সূত্র

আছে। সুতরাং শব্দটি খুব প্রাচীন। বেদে আশ্চর্য শব্দের জায়গায় আছে 'অদ্ভুত' যার অর্থ 'যা কখনও হয়নি'।

রস শাস্ত্রে দুটি রসকে সম্প্রদায়ভেদে আদি-রস বলা হয়েছে। একটি শৃঙ্গার, আরেকটি অদ্ভুত। অদ্ভুত-রসই বস্তুত প্রধান রস। পরমতত্ত্বের দর্শনে মানুষের সমস্ত অনুভব যেন অথৈ সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে থাকে। মনে হয়, যা দেখলাম এমনটি আর দেখিনি। এই লোকোত্তরতার অনুভবই মরমীয়ার আসল অনুভব। এই 'আশ্চর্য' 'অদ্ভুত' 'লোকোত্তর'কে দেখলে তাঁর প্রতি যে প্রবল আকর্ষণ অনুভব করি, তা-ই শৃঙ্গার-রস। তা-ও আদিরস। 'অদ্ভুতরসে আত্মনিমজ্জন,, আর শৃঙ্গাররসে আত্মোল্লসন। তবে বস্তুত অদ্ভুতই মুখ্য।

তাঁকে দেখা আর শোনা—বেদে 'চক্ষুঃ' আর 'শ্রবঃ'—বেদনের এই দুটি পরমকোটি। আবার যার সংবিদ্ হল, তাকে প্রকাশ করবার আকূতিও জাগা স্বাভাবিক। এই দর্শন শ্রবণ বেদন ও বদন সবই ওই অদ্ভুতরসেরই প্রপঞ্চন। মরমীয়ারা দেখে-শুনে-জেনে এসে তাঁর কথা যখন বলেন, লোকে অবাক হয়ে তা শোনে। কিন্তু কয়জন তার মর্ম বুঝতে পারে? বেদও তাই বলছেন, 'যচ্ছৃণোতি অলীকং শৃণোতি' মানুষ শুনেও কিছু বোঝে না। দোষ চিত্তের মলিনতার। আর ভাষার অক্ষমতারও দোষ আছে কিছুটা। আমাদের আটপৌরে ভাষায় তো সে-রহস্যকে প্রকাশ করা যায় না।

প্রশ্ন

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনচল্লিশ শ্লোকে (২।৩৯) সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগের কথা বলা হইয়াছে। কর্মবন্ধনমুক্তির কোন্ পথটি অর্জুনকে ধরিতে বলিলেন ভগবান?

উত্তর

সাংখ্যের পথ জ্ঞানবিচারের। তাকে ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গত করে যোগ। দুই-ই প্রয়োজন। আগে সাংখ্যবুদ্ধি, তারপর যোগবুদ্ধি।

সাংখ্যবুদ্ধি চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করল অদ্বৈতবোধে—দেখিয়ে দিল সংসারে এক অবিনাশী তৎস্বরূপের খেলা চল্ছে। এই ভাবনাকে বুদ্ধিস্থ রেখে তারপর ব্যবহারে থাকা অকর্তার ভাব নিয়ে আর ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে। এইটি হল যোগবুদ্ধি। 'সবই তিনি' অতএব 'আমি কাজ করছি অকর্তা হয়ে' আর 'কাজের ফলসম্পর্কেও আমি অনাসক্ত'—এই তিনটি বুদ্ধির সমন্বয়ে কর্মের বন্ধন কাটতে পারে। তার মধ্যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যোগবুদ্ধিরই গুরুত্ব বেশী।

প্রশ্ন

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঁয়তাল্লিশ শ্লোকটির (২।৪৫) স্বাভিমত ব্যাখ্যা লিখিবেন :—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥
—২।৪৫

উত্তর

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ—বলতে ভগবান বেদবাদকে লক্ষ্য করেছেন, যা চায় কেবল ভোগ আর ঐশ্বর্য এবং তাই নিয়ে গোঁড়ামি করে 'নান্যদস্তীতিবাদী' হয়ে। এই প্রকরণেই তিনি তার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। বলছেন, 'এটা সত্যকার বেদ নয়। বেদ কি তা আমিই জানি। আর সেই বেদকে আশ্রয় করে আমি বেদান্তও রচনা করি।' তাঁর এই বেদান্তের ইশারা পুরুষোত্তমবাদের প্রতি। আর তার ভিত্তি হল নিস্ত্রৈগুণ্য হওয়া। ভোগ আর ঐশ্বর্য গুণের খেলা। তার ঊর্ধ্বে উঠ্তে হবে, আত্মস্থ বা আত্মবী হতে হবে। সে-অবস্থায় চিত্ত আকাশবৎ প্রশান্ত। তাতে সুখ-দুঃখ শুভাশুভ লাভালাভ জয়-পরাজয়ের দ্বন্দ্ব নাই। সংসারে কিছু যোগাড় করবার আকাঙ্ক্ষাও নাই, কিছু আঁকড়ে থাক্বার দুরাগ্রহও নাই। অথচ এটা অব্যক্ত অক্ষরে লীন হওয়ার অবস্থাও নয়। গুণের অতীত হতে হবে বটে, কিন্তু বস্তুস্থিতি হবে নিত্যসত্ত্বকে আশ্রয় ক'রে। নিত্যসত্ত্ব হল শুদ্ধ সত্ত্ব—

যার মধ্যে রজোগুণের বিক্ষেপ বা তমোগুণের আবরণ নাই। যেমন নির্মল নীলাকাশে আদিত্যবৎ জ্ঞানের ছটা। এই ভাব নিয়ে থাকা এবং সর্বভূতহিতার্থে কাজ করে যাওয়া তাঁর নিমিত্ত হয়ে—এই হল যথার্থ বেদার্থের অনুশীলন বা যজ্ঞার্থক কর্মানুষ্ঠান। তার ফল, তাঁর সাধর্ম্য লাভ করা—যিনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হতেও উত্তম। এই পুরুষোত্তমের কথা বেদেও আছে বলছেন। তিনিই নিত্যসত্ত্বস্থ বা ভাগবতের ভাষায় 'সত্ত্বতনু'।

প্রশ্ন

বেদকে ত্রৈগুণ্যবিষয়ক, সকাম বলা হইল কেন? গীতার নিস্ত্রৈগুণ্য বলিতে কি অবস্থাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে? নিত্যসত্ত্বস্থেরই বা তাৎপর্য কি? বেদে যেমন কর্মকাণ্ডের উল্লেখ আছে, তেমনি তো জ্ঞানকাণ্ডের কথাও আছে। যেমন আছে, 'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ', তেমনি তো আছে একপ্রত্যয়সার তুরীয় নির্গুণভূমির কথা। বেদ সকাম, অর্জুনকে বলিলেন শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম হইতে। নিষ্কাম অর্থ তো কামনা-ত্যাগ—কর্মত্যাগ নহে। কথাগুলির নিগূঢ় অর্থ প্রকাশ করিয়া সংশয়-ভঞ্জন করুন।

উত্তর

শ্রীকৃষ্ণ এখানে তাদেরই নিন্দা করছেন, যারা 'অবিপশ্চিৎ' হয়ে বেদবাদরত মাত্র—বেদ ছাড়া আর কিছুই নাই, এই কথাই যারা বলে, অথচ যাদের কাছে বেদ কেবল কামনা-পূর্তির উপায় (২।৪২—৪৪)। তিনি অপ্রবুদ্ধ চিত্তের বেদবাদ এবং গোঁড়ামিকেই এখানে আঘাত করেছেন। এমনি করে তিনি অর্জুনের প্রজ্ঞাবাদকেও আঘাত করেছিলেন। বেদের বা প্রজ্ঞার তত্ত্ব না জেনে যারা শুধু তা নিয়ে বাগ্‌বিস্তার করে, তার দোহাই দিয়ে গোঁড়ামি করে, শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষ তাদেরই প্রতি—নইলে তিনি অন্যত্র বলেছেন—'বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো, বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্' (১৫।১৫)। বেদবাদী আর বেদবিদের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। শ্রীকৃষ্ণ বেদের কেবল জ্ঞানকাণ্ডকেই সমর্থন করেছেন, কর্মকাণ্ডকে নয়—এ-ও বলা চলে না;

'কামাত্মাদের ক্রিয়াবিশেষবাহুল্যের'ই তিনি নিন্দা করেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে-সঙ্গে এ-ও বলেছেন—যজ্ঞ ত্যাগ করবে না কখনও, কেননা যজ্ঞ মনীষীদের পাবন (১৮।৫)। যজ্ঞ সম্পর্কে একটা উদার দৃষ্টি তিনি পেয়েছিলেন তাঁর গুরু ঘোর আঙ্গিরসের কাছ থেকে—জেনেছিলেন সমস্ত জীবনটাই যজ্ঞ এবং জেনে 'অপিপাস' হয়ে গিয়েছিলেন (ছান্দোগ্য, ৩।১৬-১৭)। ঘোর ঋষির এই শিক্ষাকেই তিনি গীতায় প্রচার ক'রে অধ্যাত্মজীবনে নতুন জোয়ার আনতে চেয়েছিলেন।

নিস্ত্রৈগুণ্য হওয়ার অর্থ—অপরা-প্রকৃতির ঊর্ধ্বে থাকা। গুণাতীতের লক্ষণ তিনি বিস্তৃত করেই ব্যাখ্যা করেছেন চতুর্দশ অধ্যায়ের শেষে—জ্ঞান আর ভক্তি দু'দিক থেকেই। জ্ঞানীর দিক থেকে লক্ষণ হচ্ছে—প্রকাশ প্রবৃত্তি এবং মোহের ক্রিয়ার প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য। এটি সহজ অবস্থা না হলে হয় না। আর তখন গুণাতীতের মধ্যে স্বভাবের নিয়মে গুণের বিকারও দেখা দেয় না। গুণাতীত গুণ নিয়ে তখন খেলতে পারেন, কেননা গুণের অতীত বলেই তিনি গুণের অধীশ্বর। এটি পৌরুষের সাধনার ফল। আবার তাঁর প্রকৃতি অর্থাৎ পরা-প্রকৃতি হয়ে সাধনা করলেও আমরা এই ফলই পাব।

রজস্তমোলেশবর্জিত যে-সত্ত্ব, তাকেই নিত্যসত্ত্ব বা শুদ্ধসত্ত্ব বলে। এটি গুণময় আর গুণাতীত দু'টি অবস্থার ঠিক মাঝখানে। পুরুষ গুণাতীত থেকেই এই শুদ্ধসত্ত্বকে আশ্রয় ক'রে অর্থাৎ নিত্যসত্ত্বস্থ বা যোগস্থ থেকে গুণের জগতে নেমে আসেন। কিন্তু গুণ তখন তাঁর বন্ধনের কারণ হয় না। যা ছিল প্রাকৃত দশায় 'গুণ' বা বন্ধন-রজ্জু, তা হয়ে যায় 'গুণ' বা ধর্ম। তিনি গুণাতীত বলেই তখন অশেষকল্যাণগুণসম্পন্ন। তার প্রকাশ তাঁর ভূতহিতার্থ কর্মে, তাঁর ব্রহ্মবিহারে এবং সম্প্রসাদে।

প্রশ্ন

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ছেচল্লিশ (২।৪৬) শ্লোকের 'তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ'—এই ছত্রটির তাৎপর্য কি? 'ব্রাহ্মণস্য' কথাটি কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে?

উত্তর

বেদের কর্মকাণ্ড আর জ্ঞানকাণ্ড নিয়ে সর্ববেদ। জ্ঞানকাণ্ডের অনুশীলনে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। মানুষ তখন যথার্থ 'ব্রাহ্মণ'—'ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ'। বিজ্ঞানী ব্রাহ্মণের পক্ষে কর্মকাণ্ডের অনুশীলন নিরর্থক। কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান চিত্তশুদ্ধির হেতু হতে পারে। শুদ্ধচিত্তে বিজ্ঞানের স্ফুরণ হলে ভোগ এবং ঐশ্বর্যকে লক্ষ্য করে ক্রিয়াবিশেষবাহুল্যে জড়িয়ে যাওয়ার প্রবৃত্তিও থাকতে পারে না, কেননা সমস্ত কর্মই তো পরিসমাপ্ত হয় জ্ঞানে।

প্রশ্ন

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চাশ শ্লোকটির (২।৫০) 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্' এর রহস্য কি? 'কৌশল' কথাটির তাৎপর্য কি? কুশল ব্যক্তি কি সুকৃত-দুষ্কৃতের ঊর্ধ্বে উঠিয়া যান? 'যোগায় যুজ্যস্ব'—এ কোন্ যোগ? গীতার যোগের অর্থ কি খুব ব্যাপক নহে?

উত্তর

'কুশল' শব্দের মূল অর্থ, 'যে সাবধানে কুশ ছেদন করে'। অতএব কৌশল 'বিচক্ষণতা', চারদিক দেখে-শুনে কাজ করা। যোগস্থ হয়ে কর্ম করা হল কর্মের কৌশল, আর সে-যোগের লক্ষণ হচ্ছে সমত্ব। আপনাতে আপনি থাকা, বাইরের কোনও দ্বন্দ্বে বিচলিত না হওয়া সমত্বের পরিচয়। কঠোপনিষদে অধ্যাত্মবিষয়ের বক্তা এবং শ্রোতার কুশল হওয়ার কথা আছে। তার মূলে আছে বিস্ময়-রস এবং বোধজ প্রতিভা। এখানেও তার ইশারা আছে। কুশল কর্মীর আদর্শ হলেন শ্রীকৃষ্ণ—যাঁর কর্তব্য নাই, প্রাপ্তব্য নাই, তবুও যিনি কর্তব্যে প্রবৃত্ত। স্বভাবতই

তিনি সুকৃত-দুষ্কৃতের উর্ধ্বে। কর্ম ভাল না মন্দ—এ-বিচার চলে মনোভূমিতে, অযোগীর বেলায়। কিন্তু যোগযুক্তের বেলায় একথা ওঠেই না। যোগের লক্ষণদুটি আগেও দেওয়া হয়েছে। গীতায় যোগ শব্দটি খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে ছাড়া ষষ্ঠ অধ্যায়েও তার একটা লক্ষণ দেওয়া হয়েছে (দ্রঃ ১৮, ১৯)। তবে নির্দ্বন্দ্ব ও নিত্যসত্ত্বস্থ হওয়াকে যোগের মৌল লক্ষণ বলা যেতে পারে।

প্রশ্ন

শ্রুতি কি বিপ্রতিপন্না? সমাধিতে বুদ্ধিকে অচলা করিতে হইলে শ্রোতব্য বিষয় ছাড়িতে হইবে? 'শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যঃ'—এই শ্রুতিবচনের সঙ্গে সামঞ্জস্য কি?

উত্তর

শ্রুতি স্বরূপে বিপ্রতিপত্তির কারণ নয়। কিন্তু শ্রোতার বুদ্ধিমান্দ্যাদির তো হরদম তার বিপ্রতিপত্তি ঘটাচ্ছে।

প্রশ্ন

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের আটান্ন শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণিত আছে। যথা—

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

—২।৫৮

সংহরণ বলিতে তো এখানে প্রত্যাহারকেই বোঝানো হইয়াছে? তাহা হইলে স্থিতপ্রজ্ঞ মাত্রেই প্রত্যাহারধর্মী? এই প্রত্যাহারের মূলে জগৎ বা বিষয়ার্থের প্রতি বিতৃষ্ণাই তো রহিয়াছে? ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয় হইতে তো প্রত্যাহার চাই-ই, এমনকি মনোগত বিষয়কামনাকেও ত্যাগ করিতে হইবে। তাহা হইলে স্থিতপ্রজ্ঞ মাত্রেই বৈরাগ্যধর্মী? স্থিতপ্রজ্ঞ বা সিদ্ধের স্বাভাবিক লক্ষণ যাহা, তাহা সাধকের সাধ্য অর্থাৎ জ্ঞানসাধন—স্বামিপাদ টীকায় এই কথাটি বলিয়াছেন। প্রত্যাহারের সাধনার দৃষ্টান্ত, যেমন রামকৃষ্ণের হাত

গুটাইয়া আসিয়াছিল কামনাবিদ্ধ বস্তু বা বিষয় হইতে। সাধকের পক্ষে যাহা কষ্টসাধ্য বা প্রযত্নলভ্য, স্থিতপ্রজ্ঞের নিকট তাহা অনায়াস; কিন্তু কি সাধকাবস্থায়, কি সিদ্ধাবস্থায় প্রত্যাহারশক্তিই তো স্থিতপ্রজ্ঞের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ? প্রজ্ঞার মূলে প্রত্যাহার থাকা চাই-ই। স্থিতপ্রজ্ঞ না হইয়া বিষয় বা জগতের সংস্পর্শে যাওয়া কি কর্তব্য? নিষ্কামকর্ম প্রত্যাহার ব্যতীত হয় কি? বৈরাগ্যবিরহিত ইন্দ্রিয়ার্থের প্রতি টান বা আকর্ষণ কি পতন ঘটায় না?

উত্তর

ইন্দ্রিয়ার্থ থেকে ইন্দ্রিয়ের সংহরণ যখন স্বাভাবিক হয় তখন প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়—একথা যথার্থ। তবুও গীতায় কর্মের উপদেশ রয়েছে। এবং সে-কর্ম স্থিতপ্রজ্ঞেরই কর্ম। আর শ্রীকৃষ্ণ স্থিতপ্রজ্ঞতার আদর্শ। বারবার বলছেন, 'আমি অব্যয় অকর্তা। আমার কর্তব্য নাই, পাওয়ার কিছুই নাই, পাইনি যে তা-ও নয়, তবুও আমি কর্ম নিয়েই আছি।' এই শ্রীকৃষ্ণ-হৃদয়ের অনুধ্যানে স্থিতপ্রজ্ঞতার লক্ষণ পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। প্রবৃত্তি ছাড়া কর্ম হয় না। প্রবৃত্তি সংহরণের বা প্রত্যাহারের বিপরীত। তাহলে স্থিতপ্রজ্ঞ প্রত্যাহারধর্মী হলে কর্ম করেন কি ক'রে? এই একটা হেঁয়ালি। তার সমাধান এই।

স্বাভাবিক প্রত্যাহার হয় নিদ্রাতে, মূর্ছাতে এবং মৃত্যুতে। যোগীর প্রত্যাহার হয় সমাধিতে। তার ফলে তত্ত্বদর্শন হয়। সে-তত্ত্ব স্বরূপত অক্ষর এবং ক্ষর দুই-ই। সমাধিতে যিনি যুগপৎ অক্ষর এবং ক্ষর—দুটি পুরুষকেই নিজের মধ্যে অনুভব করেছেন, তিনি পান পুরুষোত্তমকে—যিনি ক্ষরের অতীত নিশ্চয়ই (এবং এইখানে তিনি প্রত্যাহারধর্মীও), কিন্তু আবার অক্ষর হতেও উত্তম। এই উত্তমতা তাঁর পরমাত্মস্বভাবে। তখন তিনি উপদ্রষ্টা (এইটি তাঁর অক্ষর স্বভাব, তাঁর প্রত্যাহার-সিদ্ধি), অথচ সেই সঙ্গে-সঙ্গেই অনুমন্তা ভর্তা ভোক্তা এবং মহেশ্বর। এই অনুমনন, ভরণ, ভোগ এবং ঐশ্বর্য নিশ্চয় প্রবৃত্তিধর্মী। কিন্তু এ-প্রবৃত্তি জীবের মূঢ় প্রবৃত্তি নয়, শিবের আত্মস্থ থেকে উপচে পড়া। সুতরাং

শিবের মধ্যে নিবৃত্তি এবং প্রবৃত্তি—দুটি ধারা একসঙ্গেই চলছে। তার মধ্যে নিবৃত্তির ধারাই প্রবল, বলতে গেলে স্বরূপের ত্রিপাদ। প্রবৃত্তি মাত্র একপাদ। ত্রিপাদে নিত্য প্রতিষ্ঠিত থেকে অর্থাৎ নিত্যপ্রত্যাহৃত অতএব স্থিতপ্রজ্ঞ থেকে একপাদ দিয়ে ভোগে এবং কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া শিবের স্বভাব, তাঁর শক্তির সহজ স্ফুরণ। এটি বিশ্বমূল একটি নিত্যসিদ্ধ অবস্থা।

জীব এই অবস্থা থেকে বিচ্যুত। তার প্রবৃত্তির মূলে নিবৃত্তির একটা বিধৃতি আছে, সে-সম্বন্ধে সে অচেতন। তার জন্যই তাকে ওই নিবৃত্তির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য কূর্মাচরণ করতে হয়। তার প্রথমটায় বৈতৃষ্ণ্য এবং বৈরাগ্যের সাধনাই হয় মুখ্য।

তখন অভ্যাসযোগের কাল। তারই পরিণামে ওই কূর্মের মত অঙ্গ-সংহরণ। নিজেকে ভাল করে যাচাই করে নেওয়া কোথাও কর্মের বা ভোগের কামনা রয়েছে কি না। এইটাই নিরোধযোগের মূল কথা। কালাপানিতে জাহাজ যাওয়ার মত। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, সেখানে গেলে জাহাজ আর ফেরে না। আর যে ফিরব না—এই অনাবৃত্তির সঙ্কল্প নিয়েই নচিকেতার মত যমের বিবৃত মুখে ঝাঁপ দিতে হয়। গীতার এই শ্লোকটিতে এরই অনুভব বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু তার পরেও আছে। ওখান থেকে কেউ আবার তোমাকে ফিরিয়ে দিতেও পারেন। যদি ফিরে আস, তাহলে আবার প্রবৃত্তির ধারা বইতে শুরু করবে। কিন্তু তখন এ আর তোমার কামজ প্রবৃত্তি নয়, এ ঈশ্বরের দিব্যপ্রবৃত্তি, যা জগতের মূলে। তোমার সঙ্কল্প এবং সম্ভোগ তখন তাঁরই দিব্যসঙ্কল্প এবং দিব্য সম্ভোগের প্রচ্ছটা। তখন তুমি সবকিছু করেও কিছু কর না ; তোমার ভোগ তখন বিষয়ারামতা নয়, আত্মারামতা।

প্রশ্ন

গীতার ২।৫৮ শ্লোকটির ব্যাখ্যা কি? জ্ঞানী আর প্রজ্ঞাবানের মধ্যে পার্থক্য আছে নিশ্চয়ই। কচ্ছপের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংহরণের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইলে সংহরণ বা প্রত্যাহারের সাধনায় সাধকমাত্রেরই প্রয়োজন আছে? প্রত্যাখ্যান এবং সংহরণের মধ্যে পার্থক্য আছে কি? যদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে গুটাইয়া আনিতে হয়, তবে বৈরাগ্য-সাধনার প্রতি এত কটাক্ষ কেন?

উত্তর

প্রজ্ঞা একটি পারিভাষিক শব্দ। আত্মার স্বরূপে অবস্থানের ফলে প্রজ্ঞার উদয় হয়। এটি একটি জাগ্রৎ সমাধির অবস্থা। তাতে স্থিত হতে সময় লাগে। সমাধি উপায় মাত্র, শেষ ফল নয়। সমাধির ফলে প্রজ্ঞার উন্মেষ এবং পরিশেষে তাতে স্থিতি—যাকে অধ্যায়শেষে ব্রাহ্মী স্থিতি বলা হয়েছে—তাতে থেকে ইন্দ্রিয়-সহায়ে বিষয়ে বিচরণ করেও বিধেয়াত্মা হয়ে প্রসন্ন থাকা যেতে পারে (২।৬৪)। এইটি স্থিতপ্রজ্ঞতার অনুভাব বা বাহ্যলক্ষণ। ২।৫৮ শ্লোকে তার আন্তরলক্ষণ বলা হচ্ছে। আগের দুটি শ্লোকে এই অবস্থা কি করে প্রবর্তিত হতে পারে তার সূচনা আছে।

অবস্থাটা এইরকম। বাইরে-ভিতরে তখন একেবারে বিচ্ছেদ হয়ে যায়—যেমন রামকৃষ্ণদেবের ভাষায় শুকনা সুপারির মধ্যে সুপারির মত। বিষয়-সংস্পর্শে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়, মন বাইরে ছোটে (২।৬০)। এটি তার বিপরীত। বিষয়সংস্পর্শ নিয়ে আসে ব্রহ্মসংস্পর্শ, অতএব যে-কোনও মাত্রা-স্পর্শেই ইন্দ্রিয় গুটিয়ে গিয়ে ব্রহ্মের অনুভবে চেতনাকে পৌঁছে দেয়। আয়নার উপর যেমন চলন্ত বস্তুর ছায়া পড়ে, চেতনায় তেমনি বিষয়ের ছায়া পড়ে। এটি উপলক্ষ্য মাত্র—একে জাগ্রতের লীলায়ন বলা যেতে পারে। কিন্তু তার অর্থ মনোগত কামনার (২।৫৫) সিদ্ধিতে নয়—প্রসাদে (২।৬৪)। তাই মাত্রাস্পর্শ জাগিয়ে তোলে একটা রসের অন্তঃ-স্রোত। সেই স্রোতে ভাসতে-ভাসতে বিষয় রূপান্তরিত হতে থাকে

বিষয়ীতে। সাংখ্যের ভাষায় পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতি যেন রূপান্তরিত হতে-হতে পুরুষের স্বীয়া প্রকৃতি হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা' নাটকে নটী যেমন বুদ্ধের স্তূপের সামনে নৃত্য করতে-করতে একেক করে নৃত্যের সব সাজ খসিয়ে, শেষে দেখা দিল ভিক্ষুণীর রূপে—এ-ও তেমনি।

কূর্মের অঙ্গ-সংহরণটা প্রত্যাখ্যান নয়, সংযমও বলা চলে না একে। উপনিষদের ভাষায় বলতে পার অন্তরাবৃত্তি। মাত্রাস্পর্শের উপলক্ষ্যের পিছনে ভূমাকে লক্ষ্য না করতে পারলে এ অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হয়।

প্রশ্ন

গীতার ২।৫৯ শ্লোকের 'রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে'—এর রহস্যার্থ কি? 'পরং দৃষ্ট্বা'র 'পর' শব্দ দ্বারা কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে? বিষয়তৃষ্ণা 'পর'কে না দেখিলে যায় না—ইহারই বা নিগূঢ় তাৎপর্য কি?

উত্তর

যে নিরাহার হয়, অর্থাৎ বিষয় আহরণে মানুষের স্বাভাবিক যে প্রবৃত্তি তার রাশ টেনে ধরে, অভ্যাসের ফলে কিছুদিন পরে তার বিষয়ে বৈরাগ্য দেখা দেয়। কিন্তু তখন-তখনই এই বৈরাগ্য পর-বৈরাগ্য হয়ে ওঠে না। চিত্তের গভীরে রসতৃষ্ণা তখনও গোপন থাকে। বিষয় বিনিবৃত্ত, সামনে আসছে না। চিত্ত তাকে চাইছেও না, বেমালুম ভুলে আছে। কিন্তু সে যদি অতর্কিতে কখনও এসে হাজির হয়, তখন দেখি চিত্ত তাকে বেশ রসিয়ে-রসিয়ে আস্বাদন করছে। তাহলে তো বিষয়ে তৃষ্ণা এখনও আছে, বৈরাগ্য পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। গীতা এই কথাই বলেছেন। চিত্তের গভীরে যে-বিষয়তৃষ্ণা তা যেতে পারে একমাত্র সেই পরমপুরুষকে যদি দেখতে পাই—যিনি তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভাষায় 'রসো বৈ সঃ'। আর সেই রসকে পেয়ে লোকে 'আনন্দী ভবতি'। তখন বিষয়রস বিনিবৃত্ত হয়ে প্রবৃত্ত হয় ব্রহ্মরস—যার কথা কৌষীতকীতে আছে। কোনও

বিষয় না থাকলেও যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ, তা-ই হল আত্মানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ বা সত্যানন্দ—যা-ই বল না কেন। তার আস্বাদ পেলে বিষয়রসে আর তৃষ্ণা থাকে না। এটাই হল পর-দর্শনে রসনিবৃত্তি। নিবৃত্তি বিষয়রসের ; কিন্তু নিত্যপ্রবৃত্তি ব্রহ্মরসের।

প্রশ্ন

দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঁয়ষট্টি (২।৬৫) শ্লোকের 'প্রসাদ' 'প্রসন্নচিত্ততা' কাহাকে বলে ?

উত্তর

প্রসাদ একটি অতি প্রাচীন পারিভাষিক শব্দ। তার অর্থ স্বচ্ছ (Transparence)—যেমন রামায়ণে আছে 'প্রসন্নসলিলা গোদাবরী'। উপনিষদে আছে, ধাতুপ্রসাদ হতে আত্মমহিমার উপলব্ধির কথা। ধাতু সেখানে বোঝাচ্ছে দেহ-প্রাণ-মন ইত্যাদিকে। তারা যদি স্বচ্ছ হয়ে যায়, তাহলে কাচের ভিতর দিয়ে আলোর মত আত্মচৈতন্যের দীপ্তিও দেহ-প্রাণ-মনের ভিতর দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়। এইটি প্রসাদ বা প্রসন্নচেতস্ত্বের লক্ষণ।

প্রশ্ন

দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনসত্তর (২।৬৯) শ্লোকের 'নিশাতে সংযমী জাগিয়া থাকেন, আর, সাধারণের জাগ্রত-সময় মুনিদের নিশা'—এর রহস্যার্থ কি ?

উত্তর

সর্বভূত ব্রহ্মসম্পর্কে সুপ্ত বা অবিদ্যাচ্ছন্ন। কিন্তু সংযমী তা নন। তাঁর ব্রহ্ম-সংবিৎ নিত্যজাগ্রত। আর মনের পরাক্-বৃত্তি নিয়ে বাইরের জগতে সবাই জেগে আছে। বলতে গেলে, আমাদের সংস্কৃতি সভ্যতা সবই জাগ্রৎ-ভূমির ব্যাপার, বাইরের ব্যাপার। মনের গভীরে কি হচ্ছে না হচ্ছে তার খবর কেউ রাখে না। কিন্তু মুনির কাছে বাইরের এই হাঁসফাঁসটা যেন ছায়াছবির মত, যেন রাত্রে ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের মত। কিন্তু তাহলেও তিনি তার মধ্যে

'পশ্যন্'—কি-না চোখ মেলে চেয়েই আছেন। মানুষের অবিদ্যা আর তথাকথিত বিদ্যা দুই-ই তাঁর চেতনায় ভাসছে—তিনি নিত্যচেতন। অহোরাত্রের আবর্তনের উর্ধ্বে সূর্যের মত।

প্রশ্ন

ব্রহ্মনির্বাণ আর ব্রাহ্মীস্থিতি কি এক কথা? একটিতে লয়ের ইঙ্গিত আছে, আরেকটিতে স্থিতির—এইরূপ মনে হয়।

উত্তর

ব্রহ্মনির্বাণ হল উপনিষদে যাকে বলা হয়েছে অসদ্ব্রহ্মের উপলব্ধি, মহাশূন্যের বা আকাশের উপলব্ধি। উজানের পথে ওকে লয় বলে মনে হয়, কিন্তু বস্তুত ওটি একটি নিত্যস্থিতির অবস্থা—গীতাতেই যাকে বলা হয়েছে 'বিদিতাত্মার অভিতঃ ব্রহ্মনির্বাণ'। ব্রাহ্মীস্থিতি হচ্ছে সেই আকাশেই সূর্যপ্রভাস্বর হয়ে জেগে থাকা। এটা জীবন্মুক্তের অবস্থা। কিন্তু সে-সূর্যও তো একদিন দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিবে যায়। থাকে সেই আকাশের মহাশূন্যতা, কিন্তু তা অবিদ্যা নয়—মহাবিদ্যা—'যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'।

প্রশ্ন

সাংখ্যযোগের ভিত্তি ঠিক রাখিয়া কর্ম করিলেই তো তাহা কর্মযোগে পরিণত হয়? নতুবা লক্ষ্যভ্রষ্ট কর্ম তো কর্মযোগ নয়। জ্ঞানযোগ আর কর্মযোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট বা পরাবর ভাব আনা কি উচিত? দুইটিতে সমান দৃষ্টি বা নিষ্ঠা থাকা উচিত নহে কি? উপনিষদের সিদ্ধান্ত-মতে কর্ম কি?

উত্তর

এক পরমতত্ত্ব সবকিছুকে ছেয়ে আছে—এই জ্ঞানই (২।১৭) হল সাংখ্যজ্ঞান। গীতার একেবারে শেষে শ্রীকৃষ্ণ আবার বলছেন 'যা থেকে সর্বভূতের প্রবৃত্তি বা কর্মচেষ্টা, যিনি সবকিছু ছেয়ে আছেন, নিজের কর্ম দিয়ে তাঁর অর্চনা করলেই মানুষ সিদ্ধিলাভ করতে পারে'

(১৮।৪৬)। এই মহাশ্লোকটিতে সাংখ্যজ্ঞান, শক্তিজ্ঞান এবং ভক্তিকে আশ্রয় করে ঈশ্বরের অর্চনাবুদ্ধিতে কর্ম করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এটিই যথার্থ কর্মযোগ এবং গীতার সার শিক্ষা।

সাংখ্যজ্ঞানে যে-অবস্থা লাভ হয় কর্মযোগেও তা-ই হয়, সুতরাং দুটিতে সমান নিষ্ঠার কথা গীতা নিজেই বলছেন (৫।৪-৫)। উপনিষদও কর্মত্যাগ করতে বলেননি, কর্ম করতে করতে একশ' বছর বেঁচে থাকবার কথাই বলেছেন। আর বলেছেন, অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলে তা পুরুষকে লিপ্ত করে না।

প্রশ্ন

সন্ন্যাসের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব অর্পণ কি গীতাকারের লক্ষ্য ?

উত্তর

না।

প্রশ্ন

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ছয় শ্লোকে (৩।৬) 'মিথ্যাচার' শব্দটির মধ্যে একটু কটাক্ষ নাই কি ? এই কটাক্ষ বা মন্তব্য কেন ?

উত্তর

ওখানে তথ্যকথন আছে, কটাক্ষ তো নাই। আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংযম-সাধনা করতে গিয়ে কর্মেন্দ্রিয়কে সংযত করি কিন্তু মনকে করি না, মনে-মনে বিষয়-চিন্তা সমানেই চলতে থাকে। এটা নিজের সঙ্গেই মিথ্যাচার এবং আত্মার মূঢ়তা। এমনি করে নিরাহার হলে বিষয় নিবর্তিত হয় মাত্র, কিন্তু মনের রস তো মরে না। পরমসত্যকে না দেখা পর্যন্ত, তার রসকেই সব রসের উৎস বলে না জানা পর্যন্ত তা মরতেও পারে না (২।৫৯)।

প্রশ্ন

'যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ' আর 'পচন্ত্যাত্মকারণাৎ—দুইটির মধ্যে পার্থক্য কি ?

উত্তর

নিজের ভোগের জন্য কর্ম করা হল আত্মার্থে পাক। আর তাঁর উদ্দেশে তাঁর তৃপ্তির জন্য কর্ম ক'রে তাঁর প্রসাদরূপে তার ফলকে ভোগ করা—সে সুখ-দুঃখ লাভালাভ যা-ই হক না কেন—তা-ই যজ্ঞশিষ্টের অশন বা ইড়াভক্ষণ। ইড়াভক্ষণ যাজ্ঞিকদের একটি অতি প্রাচীন বিধি ছিল। গীতা তাকেই জীবনের সব কর্মে ব্যাপ্ত করবার কথা বলছেন।

প্রশ্ন

তৃতীয় অধ্যায়ের পনের শ্লোকটির (৩।১৫)—'ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্' আর 'কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং'—এই দুইটি পরিভাষার তাৎপর্য কি ? 'প্রবর্তিত চক্র' —ইহারই বা রহস্য কি ?

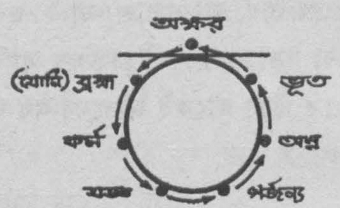
উত্তর

তৃতীয় অধ্যায়ের ১৪।১৫ শ্লোকে একটি চক্রের কথা বলা হয়েছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে ব্রহ্মচক্রের কথা আছে (১।৬)—এটি সেই চক্র। আষাঢ়ী পূর্ণিমায় বুদ্ধদেবের 'ধম্মচক্র'-প্রবর্তনের কথা পাই বৌদ্ধ-শাস্ত্রে। এখানেও ১৬ শ্লোকে বলা হয়েছে, এই 'প্রবর্তিত' চক্রের অনুবর্তন যে না করে তার জীবন বৃথা। এক্ষেত্রে ভাষার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

চক্রের পরিধিতে অবস্থিত যে-কোনও বিন্দু চক্রের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একবার নীচে নামে আবার উপরে ওঠে। এর বিপরীত গতিও সম্ভব। মোটের উপর নামা-ওঠা একটা আছেই। ব্রহ্ম নেমে আসছেন, জীব উঠে যাচ্ছে। ব্রহ্ম নেমে আসছেন যজ্ঞে ; আর এই যজ্ঞকে আশ্রয় করেই জীব উপরে উঠে যাচ্ছে। এইখানেই তার চক্রানুবর্তনের সার্থকতা। তাঁর নেমে আসাটা গায়ত্রীতে ব্যক্ত হয়েছে 'ধীমহি'—'হৃদয়ে নিহিত করি' এই পদে। উঠে যাওয়াটা আছে তার পরেই—'প্রচোদয়াৎ'—তিনি যেন আমাদের ঠেলে তোলেন, এই পদে। তাঁর নেমে আসাটা উপনিষদে (এবং সংহিতাতেও)

'আবেশ' ; ভাগবতে 'অবতার'। উঠে যাওয়াটা তাহলে উত্তার, স্বর্গারোহণ ইত্যাদি।

এখন চক্রটি এই রকম হবে :—



লক্ষণীয় 'অক্ষর' চক্রের বাইরে, তাঁর ওঠা-নামা নাই। অক্ষরের দিক থেকে দক্ষিণাবর্তে শক্তির ধারা নেমে আসছে ব্রহ্মে। এই ব্রহ্ম 'মহদ্ ব্রহ্ম' বা যোনি (১৪।৩-৪)। এই যোনি থেকে যে ভূত-ভাবোদ্ভবকর 'বিসর্গ' (সংহিতার 'বিসৃষ্টি') তা-ই হল কর্ম (৮।৩)। শক্তি আরও নীচে নামল। এটি শক্তিপাত বা আবেশ বা প্রসাদ। বাইরে থেকে নীচে নামা বটে, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে একটা উজানমুখী সঙ্কল্প আছে। উজানের এই অন্তর্গূঢ় টানেই ক্রমে সমস্ত কর্ম যজ্ঞ হয়ে ওঠে (তুঃ গীতা ৩।৯। যজ্ঞ ছাড়া সব কর্মই বন্ধন)। এই যজ্ঞকে আশ্রয় করে দ্যুলোক হতে দেবতার প্রজ্ঞা আর প্রাণ পর্জন্যের ধারাসারে পৃথিবীতে নেমে আসে। বেদে তার ফলাও বর্ণনা আছে। সেই পর্জন্যে পৃথিবী বা আধারশক্তি অভিষিক্ত হয়ে অন্ন উৎপাদন করে। এই অন্ন সাধারণ অন্নই নয় শুধু। বরং তার অন্তর্নিহিত 'ইড়া' বা 'ইষ্' বা অগ্নিশক্তি, গীতার ভাষায় 'যজ্ঞশিষ্ট অমৃত' (৩।১৩)। তা থেকে যে-ভূত (উপনিষদে 'মহাভূত' লক্ষণীয়) উৎপন্ন হয়, সংহিতায় এবং উপনিষদে তাঁকে বলা হয়েছে 'অন্নাদ'। এই অন্নাদ পুরুষ বা ছান্দোগ্যের বৈশ্বানর বিদ্যার অধিকারী পুরুষ যখন অক্ষর-ব্রহ্মে সমাপন্ন হন, তখন তিনি অনুভব করেন তাঁ থেকেই আবার ব্রহ্ম, কর্ম, যজ্ঞ ইত্যাদির ক্রমিক উদ্ভব। এই হল ব্রহ্মচক্রের প্রবর্তন, যে-চক্র সর্বব্যাপ্ত এবং যজ্ঞ যার প্রতিষ্ঠা।

প্রশ্ন

অসক্ত হইয়া সতত কার্য সমাচরণের কৌশল কি ?

উত্তর

সতত কর্ম করতেই হবে, কেননা কর্ম না ক'রে এক মুহূর্তও কেউ থাকতে পারে না। প্রকৃতিতে গুণের বিপরিণাম ঘটছে আর তার ফলে আপনা হতে কর্ম হয়েই চলেছে। সুতরাং কর্মত্যাগ কখনও হতে পারে না। কিন্তু কর্ম করতে গিয়ে আমরা জড়িয়ে যাচ্ছি ফলাকাঙ্ক্ষায়—এই কর্মের এই ফল হ'ক এইরকম একটা দুরাগ্রহে। এই দুটি ছাড়তে হবে—'আমি কর্তা' এই বোধ থাকবে না, আর কর্মের সিদ্ধিতে উল্লাস আর অসিদ্ধিতে বিষাদ এই বোধও থাকবে না। তাহলেই অসক্ত হয়ে কর্ম করা হবে।

প্রশ্ন

তৃতীয় অধ্যায়ের বিশ শ্লোক (৩।২০) হইতে আরম্ভ করিয়া তেইশ (৩।২৩) শ্লোক পর্যন্ত—শ্লোকগুলির রহস্যার্থ কি ?

উত্তর

গোড়াতেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, তোমার যেন অকর্মে আসক্তি না হয় (২।৪৭)। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এ-ও বললেন, বুদ্ধিযুক্ত হয়েই কর্ম করতে হবে (২।৪৯)—অমনি-অমনি কর্ম করে গেলে চলবে না। বুদ্ধি হল বিজ্ঞান বা প্রজ্ঞা, যাতে স্থির হয়ে কর্ম করা হল কর্মযোগ। অর্জুনের মনে সংশয় জাগল, 'তাহলে বুদ্ধির চাইতে তো কর্মই বড় হল। তবে আমাকে এই কর্মে—বিশেষতঃ যুদ্ধের মত "ঘোর কর্মে" নিয়োজিত করছ কেন ?' (৩।১)। শ্রীকৃষ্ণ যা বলছেন, তার তাৎপর্য হল, বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা কর্ম থেকে বড় হলেই যে জ্ঞানযোগের দোহাই দিয়ে কর্ম ছাড়তে হবে এমন কোনও কথা নাই। কর্ম কেন করতে হবে, তিনি তার দুটি লৌকিক হেতু দেখাচ্ছেন। প্রথম হেতুটি হল, কর্মত্যাগ সম্ভব নয়, কেননা কর্ম না

ক'রে কেউ ক্ষণমাত্রও থাকতে পারে না (৩।৫)। অন্তত শরীরযাত্রা নির্বাহের জন্য সবাইকে কিছু-না-কিছু করতেই হয়। আধুনিক Economics বা বার্তাশাস্ত্র এই সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। এটা কর্মের বৃত্তিঘটিত (economics) ব্যবস্থা, যা অপরিহার্য। দ্বিতীয় হেতুটি হল, লোকসংগ্রহের জন্য অর্থাৎ সমাজব্যবস্থাকে চালু রাখবার জন্যও কর্ম করা দরকার। একে দণ্ডনীতিঘটিত (Politics) কর্মব্যবস্থা বলতে পার। বার্তা বা দণ্ডনীতির অনুশাসনে কর্ম সবাইকে করতে হবে—এখন সে-কর্ম মানুষ যোগস্থ হয়ে করুক আর অযোগী হয়েই করুক।

কর্মযোগের অনুকূলে এই লৌকিক যুক্তি উপস্থাপনের পর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, মানুষ অনুকরণপ্রিয়। যাকে সে শ্রেষ্ঠ মনে করে, তার আচরণকে সে বিনা দ্বিধায় অনুসরণ করে। আমাকে লোকে মানে-গণে। আমি যদি লোকের সামনে কর্মত্যাগের আদর্শ তুলে ধরি, তারা তাহলে আমারই অনুসরণ করবে। তখন প্রশ্ন হবে, যারা কর্মত্যাগকেই আদর্শ করবে, তাদের পেট চলবে কি ক'রে? সমাজে যদি ক্রমশ এই কর্মত্যাগীদের সংখ্যাধিক্য ঘটে, তাহলে সমাজ-ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যাবে না কি, সবাই উচ্ছন্নে যাবে না কি? শ্রীকৃষ্ণের এই আশঙ্কা যে আমাদের দেশে ভয়াবহরূপে সত্য হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। এই সম্ভাব্য অনিষ্টের প্রতিবিধানকল্পেই তিনি বললেন, 'দেখ, তিনলোকে আমার করবার কিছুই নাই। কাজ ক'রে একটা-কিছু ফল পেতে হবে আমায়, তা-ও নয়। আমি তো সব পেয়েই রয়েছি—কেননা আমি আত্মারাম বলেই আপ্তকাম। কিন্তু তবুও দেখ, আমি কাজ নিয়েই রয়েছি। আর কাজ করছি অতন্দ্র হয়ে, কোথাও ফাঁক না রেখে। আমাকে দেখে লোকে আমার মত চলতে চাইবে, কেননা আমাকে সবাই আদর্শ পুরুষ বলে জানে। আমি কর্মকে খাটো করলে সবাই তাই করবে। কর্তব্য কর্ম না করার দরুণ সমাজ তখন উচ্ছন্নে যাবে, আর তার ফলে সমাজের নৈতিক

ভিত্তি পর্যন্ত টলে যাবে। তখন তুমি যে-বর্ণসঙ্করের ভয় করছিলে, ওই কর্মত্যাগের ভিতর দিয়েই সেই বর্ণসঙ্কর দেখা দেবে। প্রসঙ্গক্রমে বলছি, এখানে 'সঙ্কর' বলতে স্থূল বর্ণসঙ্করকে লক্ষ্য করা হচ্ছে না, অতি সূক্ষ্ম ধর্মসঙ্করই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দিষ্ট, যার অজস্র উদাহরণ চারিদিকে দেখতে পাচ্ছি।

প্রশ্ন

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ছাব্বিশ শ্লোকে (৩।২৬) আছে—

'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

শ্লোকটির রহস্যার্থ কি ?

উত্তর

যারা অজ্ঞ অর্থাৎ অবিদ্যাচ্ছন্ন, যারা কর্মসঙ্গী অর্থাৎ আসক্তি নিয়ে কর্ম করা যাদের স্বভাব, তাদেরও নৈষ্কর্ম্যের পথে নিয়ে যেতে হবে—কিন্তু ধীরে-ধীরে। হঠাৎ বড়-বড় কথা বলে তাদের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করা উচিত নয়। আর বাইরে কাজকর্ম ছেড়ে দেওয়াটাই তো নৈষ্কর্ম্য নয়। ত্যাগ বাইরের ব্যাপার নয়; আসলে তা ভিতরের ব্যাপার। রসের পরিপাক হলে ফলের বোঁটা আপনি ছেড়ে গিয়ে ফলটা গাছ থেকে পড়ে যায়। কাঁচা ফলকে বোঁটা ছিঁড়ে নামানো আর কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো —কোনটাই স্বধর্মপুষ্টির অনুকূল নয়। তাই যিনি বিদ্বান্, তিনিও কর্মত্যাগ করবেন না—যদিও তিনি ভিতরে-ভিতরে বেশ বোঝেন কর্ম করাটা তাঁর দায় নয়। তিনি কাজ করলেও পারেন, না করলেও পারেন। তবুও সমাজে একটা বহির্বিপ্লব এনে সবকিছু বানচাল ক'রে দেওয়াকে বলা যেতে পারে সেই অবিদ্যারই খেলা। যিনি বিদ্বান্, তিনি যোগযুক্ত হয়ে কর্ম করেন—সবার সঙ্গে মিলে মিশে তাদের মতই তিনি কাজ করে যান। বাইরে বিদ্বানের কাজ আর অবিদ্বানের কাজের ধরণ-ধারণ একই রকম। কিন্তু

ভিতরে-ভিতরে দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। একজন কাজ করেন শিবের মত শান্ত থেকে, নিঃস্পৃহ হয়ে, ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত হয়ে। আরেকজনের কাজ হল ভূতের মত—লাফালাফি ক'রে, চ্যাঁচামেচি ক'রে, হেসে-কেঁদে, সৃষ্টি ওলটপালট ক'রে। কিন্তু বিদ্বানের প্রভাব ক্রমে ওই অবিদ্বানের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। তাঁকে দেখে-দেখে তাঁরাও ক্রমে শান্ত ও নিঃস্পৃহ হয়ে কর্ম করতে শেখে। তখন কর্মে তারাও সত্যকার রস পায়, তারাও বুঝতে পারে, আসলে কর্ম হচ্ছে দাপাদাপি করা নয়, গাছের মত ফুল ফুটিয়ে চলা। কর্মে এমনি ক'রে রস লাগানো হল একটা মস্ত বড় অন্তর্বিপ্লব—যা বিদ্বান নিঃশব্দে নিয়ে আসেন অবিদ্বানের জগতে। একেই বলা হয়েছে 'জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি'—ওদের সঙ্গে কাজ ক'রে ক'রে কর্মে রস লাগিয়ে দেবেন যোগস্থ কর্মী।

প্রশ্ন

'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে'—জীবে এই কর্তার অভিমান আসে কোথা হইতে?

উত্তর

ব্রহ্মই জীব হয়েছেন, সুতরাং জীবের যা-কিছু সব আসে ব্রহ্ম হতে। 'অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে' (১০।৮)। আদি অহঙ্কার ব্রহ্মের। 'ব্রহ্ম অবেৎ, অহং ব্রহ্মাস্মি ইতি'—এই অহংই জীবে সঞ্চারিত হয়, সে নিজেকে অনুভব করে 'বৃহৎ' ব'লে। বৃহতের এই অনুভব তাকে একদিক দিয়ে বড় করে, কিন্তু অবিদ্যার খাদ মেশানো থাকে ব'লে আরেক দিক দিয়ে তা বন্ধনেরও কারণ হয়। কর্ম করবার সময় 'আমি কর্তা'—এটা ভাবা জীবের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কর্তা দু'রকমের—স্বতন্ত্র কর্তা আর প্রয়োজক কর্তা। আপাতদৃষ্টিতে সবই আমি করছি, কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় আমি কিছুই 'করছি না', সবই 'হচ্ছে'—কেউ আমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। রামকৃষ্ণদেবের উপমা, 'ফুটন্ত জলে আলু-পটল

লাফাচ্ছে, ভাবছে আমরাই লাফাচ্ছি, কিন্তু জাল টেনে নিতেই সব ঠাণ্ডা!' আমার প্রাকৃত কর্মের মূলে বস্তুত ঈশ্বরের প্রেরণা, আমি নিমিত্ত মাত্র, তিনিই প্রয়োজক, আমি প্রযোজ্য, তিনিই আমার কর্ম ও কর্মফলের হেতু—এই বুদ্ধিতে কর্ম অসংমূঢ় এবং সহজ হয়।

প্রশ্ন

স্বধর্মে নিধন শ্রেয়ঃ, আর পরধর্মকে ভয়াবহ বলা হইল কেন ?

উত্তর

ধর্ম মানে যা আমাকে ধরে আছে অর্থাৎ আমার জীবনের মূলে যে ঈশ্বর-সঙ্কল্প রয়েছে, তা-ই আমার ধর্ম। ঈশ্বর সব জীবকে এক করে সৃষ্টি করেননি। তাঁর বিচিত্র সঙ্কল্পের প্রকাশ বিচিত্র জীবে। তাই সবার ধর্ম এক নয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে অর্জুনকে দিয়ে তিনি যা করাতে চান, তা ভৈক্ষ্য নয়—যুদ্ধ। মোহবশত অর্জুনের মনে হল, যুদ্ধের চাইতে ভৈক্ষ্য ভাল। হয়তো ভাল, কিন্তু অর্জুনের পক্ষে ভাল নয়। এখনও তাঁর মধ্যে ক্ষাত্রধর্মই প্রবল। তিনি অন্যায় দেখলে দণ্ড দিতে চাইবেন এখনও। ভিক্ষু ব্রাহ্মণের মত সব কিছু সয়ে যাওয়া, মানাপমানে তুল্যভাব বহন করা, তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই ক্ষত্রিয় হয়ে ভিক্ষুর বা ব্রাহ্মণের ধর্ম সুন্দর মনে করে তা গ্রহণ করলে তার ফল যেমন অপরের পক্ষে তেমনি তার নিজের পক্ষেই ভয়ানক হবে। ভিক্ষু হবার মত যোগ্যতা অর্জন করবার আগে ক্ষাত্রধর্মের অনুশীলনের দ্বারা তাঁকে কর্ম ক্ষয় করে নিতে হবে।

প্রশ্ন

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে আছে—'ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবান্'। এই যোগ কোন্ যোগ—হঠযোগ না রাজযোগ? কোন্ যোগ কালপ্রভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, যে-যোগের রহস্যের কথা ভক্ত অর্জুনকে ভগবান্ বলিয়াছিলেন ?

উত্তর

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের গোড়ায় যে 'অব্যয় যোগের' কথা বলা হয়েছে, তা রাজযোগ এবং হঠযোগকেও ছাপিয়ে। হঠযোগের প্রধান সাধন হল প্রাণায়াম, আর রাজযোগের প্রাথমিক সাধন প্রত্যাহার—যথাক্রমে বায়ুর নিরোধ আর মনের (চিত্তবৃত্তির) নিরোধের দ্বারা প্রশমে পৌঁছনো যার লক্ষ্য। এর উপদেশও গীতায় আছে। অধ্যাত্ম-সাধনায় এরা অপরিহার্য। কিন্তু এরাই শেষ নয়।

এই অব্যয় যোগ কি, তা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশেষ করে বলা হয়েছে, তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জুনের একটা সংশয় দূর করবার জন্য তার অনুবৃত্তিও আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুটি বুদ্ধির কথা বলা হয়েছে—সাংখ্যবুদ্ধি আর যোগবুদ্ধি। 'যেন সর্বমিদং ততম্'—যিনি সব ছেয়ে আছেন, তাঁর বোধোদয় (২।১৭) হল সাংখ্যবুদ্ধি। এই বুদ্ধি 'ব্যবসায়াত্মিকা' এতে চিত্ত সমাধিতে প্রতিষ্ঠিত হয় (২।৪৪)। সে-সমাধি অবশ্য স্থিতপ্রজ্ঞের সমাধি, যা চলা-বলার মধ্যেও অটুট থাকে। এমনি সমাধিতে থেকে বা যোগস্থ হয়ে নিরাসক্তভাবে কাজ করা হল যোগবুদ্ধি। দুটি মিলিয়ে গীতার বুদ্ধিযোগ (২।৪৯, ১০।১০, ১৮।৫৭)। শ্রীকৃষ্ণ এখানে এই যোগের কথাই বলছেন। এই যোগে স্থিত হয়ে কি ভাবে চলা যায়, তার উদ্দেশ গীতায় দু'জায়গায় আছে। একবার আছে গোড়ার দিকে—স্থিতপ্রজ্ঞতার বর্ণনায়। সেখানে বলা হচ্ছে রাগ-দ্বেষ হতে বিযুক্ত হয়ে এবং আত্মবশ্য ইন্দ্রিয় নিয়ে আর নিজেকে ঈশ্বরের বিধেয় করে বিষয়ে বিচরণ করে প্রসাদ লাভ করার কথা (২।৬৪)। আরেকবার আছে শেষের দিকে—বলা হচ্ছে, ঈশ্বর হতেই আসছে সর্বভূতের কর্ম-প্রবৃত্তি, তিনিই ছেয়ে আছেন সবকিছু —এই বোধ নিয়ে (এটাই হল সাংখ্যবুদ্ধি যা বুদ্ধিযোগের প্রথম অঙ্গ) মানুষ যদি নিজের কর্মকে তাঁর অর্চনা করে তুলতে পারে (এটা হল

যোগবুদ্ধি, বুদ্ধিযোগের দ্বিতীয় অঙ্গ), তাহলে সে সিদ্ধিলাভ করে।

দেখা যাচ্ছে এই অব্যয় যোগ বা বুদ্ধিযোগ সর্বজনীন, সর্বকালীন এবং সার্বভৌম। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'আমি এই যোগ সৃষ্টির আদিতে বলেছিলাম বিবস্বানকে, বিবস্বান বলেছিলেন মনুকে, আর মনু বলেছিলেন ইক্ষ্বাকুকে (৪।১)।' বেদে বিবস্বান আদিত্য, উপনিষদের প্রাজাপত্য সূর্য, যিনি বিশ্বসৃষ্টির মূলে। বেদেই মনু মানবজাতির 'প্রত্নঃ পিতা', মানবের আদিপুরুষ। আর বিষ্ণুপুরাণে পাই, মনুর ঘ্রাণ বা প্রাণ হতে ইক্ষ্বাকুর জন্ম, যেন তিনিই প্রথম মানব। তাহলে শ্রীকৃষ্ণের উক্তির তাৎপর্য হল, এই অব্যয় যোগ সৃষ্টির আদিতে উৎসারিত হয়েছে আদিত্য থেকে এবং সংক্রামিত হয়েছে মানবের আদিপুরুষে এবং তাঁহতে আদি মানবে। ইক্ষ্বাকু এই যোগের প্রথম সিদ্ধযোগী। তারপর রাজর্ষিদের মধ্যে এই যোগ সংক্রামিত হয়েছিল পরম্পরাক্রমে (৪।২)। ক্রমে তা লুপ্ত হয়ে যায়। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছে আবার তাকে ব্যক্ত করেন। এই যোগই সর্বসমন্বয়ী পূর্ণযোগ—যাতে জ্ঞান, কর্ম আর ভক্তির সমাহার হয়েছে।

প্রশ্ন

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের নবম শ্লোকে (৪।৯) আছে, ভগবানের দিব্য জন্ম এবং কর্মের কথা। এই দিব্য জন্ম-কর্মের রহস্য তত্ত্বতঃ যিনি জানেন, তাঁহাকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। 'মাম্ এতি'—এই ভগবদুক্তির রহস্যই বা কি? ভক্ত কি ভগবানের সঙ্গে 'সম্ভবামি যুগে যুগে' আসেন না?

উত্তর

প্রথমেই বলি, তোমার প্রশ্নের জবাব এক কথায় হয়ে যায়। যিনি 'তত্ত্বত' ভগবানের দিব্য জন্ম ও কর্ম জানেন, তিনি তাঁতেই পৌঁছন অর্থাৎ তিনি হয়ে যান। তারপর আর তাঁর পুনর্জন্ম হতে পারে না, কেননা ভগবানেরও তো পুনর্জন্ম হয় না— যা হয় তা সম্ভূতি

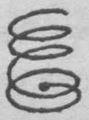
বা দিব্যজন্ম। অথচ এই সম্ভূতির ঊর্ধ্বে আবার তিনি অজ অব্যয়াত্মা এবং ভূত-মহেশ্বররূপে অসম্ভূতিতে নিত্যপ্রতিষ্ঠ। পুনর্জন্ম জীবের, আর ভগবানের দিব্যজন্ম বা নিত্যসম্ভূতি। তুমি যদি তাঁকে পাও এবং তাঁর এই সম্ভূতিকে স্বীকার কর, তাহলে তাঁর দিব্যজন্মের সঙ্গে-সঙ্গে তোমারও দিব্যজন্ম অতএব দিব্যকর্ম হবে—তাঁর পরিকররূপে। ওটা তোমার পুনর্জন্ম নয়। পুনর্জন্ম হয় সংসারে—ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই তিন লোকের মধ্যে জীবের আবর্তনে। স্বর্লোককে অবিজ্ঞানী ভেদ করতে পারে না। কিন্তু বিজ্ঞানী পারেন। তখন তিনি যেমন জন্মনিরোধ বা অনাবৃত্তির দিকে উজিয়ে যেতে পারেন এবং অবশেষে ব্রহ্মনির্বাণে নিরঞ্জন পরম সাম্য লাভ করতে পারেন, তেমনি জ্ঞানী বা ভক্ত বা শক্তিমান আধিকারিক পুরুষরূপে এই সংসারেও ফিরে আসতে পারেন। এ ফিরে-আসা 'অবশঃ প্রকৃতের্ বশাৎ' নয়, ফিরে আসা তাঁর ইচ্ছায়, তাঁর পরিকর হয়ে।

এ-বিচার হল এদিক থেকে ওদিকে উজিয়ে যাওয়ার বেলায়। আবার ওদিক থেকে এদিকে নেমে আসার বেলাতেও একটা বিচার আছে।

ভগবানই সবকিছু হয়েছেন। এই হওয়াটা তাঁর যোগমায়ার বশে, এটা তাঁর ঐশ্বরযোগের একটা বিভূতি। তিনি যখন হন, তখন বিদ্যা নিয়েই হন—জীবের মতে অবিদ্যা নিয়ে নয়। তাই তিনি অর্জুনকে বললেন, আমার আর তোমার অনেক জন্ম পার হয়ে গেছে, আমি তার সবগুলি জানি, কিন্তু তুমি জান না।

অতএব ভগবানের দিব্য জন্ম এবং দিব্য কর্ম একটা চিন্ময় বিসৃষ্টি, আমাদের জন্ম ও কর্মের মত অবিদ্যাগ্রস্ত নয়। পুনর্জন্মের এবং আয়াসপূর্বক জন্মনিরোধের কথা জীবের বেলাতেই খাটে, তাঁর বেলাতে সবটাই চিজ্জ্যোতিতে ভাস্বর। আমাদের অবিদ্যার মধ্যেও তিনি অন্তর্যামিরূপে বিদ্যার নিগূঢ় আলো—বেদের ভাষায় তিনি 'গোপাঃ'।

তাঁর এই বিসৃষ্টি বা সম্ভূতি বা দিব্যজন্ম ও কর্মের আবার দুটি রীতি আছে। শৈবদর্শনের ভাষায় একটিতে তাঁর নিগ্রহশক্তির প্রকাশ—তিনি **স্বেচ্ছায়** গুটিয়ে আসছেন চৈতন্য থেকে জড়ে। কিন্তু তবুও জড়ত্বের সবটাই জড়ত্ব নয়। তার গভীরে রয়েছে চিৎকণ, যা অহরহ বিস্ফারিত হতে চাইছে। এইটি একসময় প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে—যেমন মাটির তলার বীজের একসময় ঘুম ভাঙে। এই ব্যাপারটি হল তাঁর অনুগ্রহশক্তির খেলা—জীব থেকে শিব হওয়ার তাগিদ। এটি যেমন ব্যক্তিজীবনে ঘটে, তেমনি সমষ্টি-জীবনেও ঘটে। প্রকৃতি-পরিণামে এগুলি হল যুগ-সন্ধি। সমস্ত ব্যাপারটাকে বোঝানো যেতে পারে একটা কম্বুরেখার (Spiral) ঊর্ধ্বমুখী আবর্তন দিয়ে—যেমন আমরা দেখি কুমোরের চাকে মাটির তালের ঘট হওয়ার বেলায়। সেখানে চাকাটা এক ভূমিতে থেকে ঘুরছে। মাটির তালটা তার সঙ্গে ঘুরতে-ঘুরতে ধীরে-ধীরে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। চক্রাবর্তনের মধ্যে আছে খানিকটা সামনের দিকে গিয়ে আবার পিছনে হটা; কিন্তু এই কম্বুরেখার গতিতে পিছনে হটেও রেখাটা আগের ভূমি থেকে খানিকটা উপরে চলে যায় এই ভাবে—



যেমন স্প্রিংএ বা স্ক্রুতে দেখা যায়। এই যে গোড়ার কাছাকাছি এসে ঊর্ধ্বভূমিতে ঠেলে উঠা, ওইখানেই তাঁর অনুগ্রহশক্তির ক্রিয়া। বিশ্বে এটা এইভাবে ঘটে: একবার সাধুদের রাজ্য স্থাপিত হল এবং তা বেশ উন্নতির পথে এগিয়ে চলল। তারপর দেখা দিল অবক্ষয়—জৈনদের ভাষায় উৎসর্পিণী গতির পর এল অবসর্পিণী গতি। দুষ্কৃতরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আর কিছুতেই তাদের ঠেকানো যাচ্ছে না।

এই সময় তাঁর 'সম্ভূতি' হয় (সম্ভবামি) যুগান্তরের সন্ধিক্ষণে। একটা কুরুক্ষেত্র ঘটে, কিন্তু তারপর বিশ্বের চেতনা আগের চাইতে উন্নততর ভূমিতে উঠে যায় কম্বুরেখার গতিতে। এই-যে যুগসন্ধিতে বা জীবনের একটি বিশিষ্ট লগ্নে তাঁর শক্তিপাত বা অনুগ্রহ তা-ই হল তাঁর দিব্যজন্ম। যুগে-যুগে এটা ঘটছে এবং তিনি তা জানেন। তাঁর ইচ্ছাতেই এটা ঘটছে, তিনিই এমনি করে জড়ের আবর্তন থেকে শক্তির কম্বুরেখায় উজিয়ে চলছেন—এই হল তাঁর সম্ভূতির তত্ত্ব। এ যে জানে সে তাঁর ইচ্ছাতেই কম্বুরেখার গতি থেকে অধ্বর গতিতে চলে যায়, তার আর আবর্তন হয় না; অথবা সম্ভূতিতে কম্বুরেখায় আবর্তিত হতে-হতে সে এগিয়ে চলে। তখন আবর্তন হয়, জন্ম হয়; কিন্তু তাঁর জন্মের মতই তা দিব্যজন্ম।

প্রশ্ন

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের (৪।১৭-১৮) শ্লোকে কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্মের কথা আছে। কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম যিনি দেখেন, তাঁহাকে বলা হইয়াছে —'কৃৎস্নকর্মকৃৎ'। 'গহনা কর্মণো গতিঃ'—কাজেই কর্মরহস্যটি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন।

উত্তর

কর্মের একটা সার্বভৌম লক্ষণ গীতায় আছে—ভূতভাবোদ্ভবকর বিসর্গই কর্ম (৮।৩)। বিসর্গকে বেদে বলা হয়েছে 'বিসৃষ্টি' কি-না— এক পরম উৎস হতে ভুবনের উৎসারণ। এই উৎসারণের একটি বেগ চিৎ হতে জড় পর্যন্ত নেমে এসেছে, আবার আরেকটি বেগ জড় হতে চিৎ পর্যন্ত, ভূত হতে ভাব পর্যন্ত উজিয়ে চল্‌ছে (উদ্—ভব)। দুটিই কর্ম—ভগবানের নিত্য কর্ম (বর্ত এব চ কর্মণি ৩।২২)। কিন্তু এই বিসৃষ্টি বা সম্ভূতির উর্ধ্বে তিনি আবার অকর্তা—'চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি করেও তিনি কিছুই করছেন না' (৪।১৩)। বিসৃষ্টির উর্ধ্বে তাঁর এই সাক্ষিভাবে স্থিতির আদর্শকে আমরাও অনুসরণ করতে পারি। তখন আমরা দেখি, আমাদের প্রকৃতি নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু

পুরুষরূপে আমরা শান্ত হয়ে আছি ; উপদ্রষ্টা অনুমন্তা ভর্তা—এমনকি ভোক্তা ঈশ্বর হয়ে আছি। এই অবস্থা অকর্মের অবস্থা।

কিন্তু যেহেতু আমরা এই অবস্থাতেও অনুমন্তা ভর্তা এবং ভোক্তা (গীতা এখানে প্রচলিত সাংখ্যমত অনুসরণ করছেন না কিন্তু—উজিয়ে গিয়ে আবার ভাটিয়ে আসছেন), তখন আমাদের প্রেরণায় কর্ম তো স্বত উৎসারিত হবেই। এই কর্ম যোগস্থের কর্ম—যাতে অহঙ্কারবিমূঢ় কর্তৃত্বের ভাব নাই, অথবা ফলের আকাঙ্ক্ষা নাই। এ-অবস্থায় আমরা কর্ম করেও কর্ম করি না ; আবার অহং নিয়ে কর্ম করি না বলেই শক্তির স্বত উৎসারণে আমাদের ভিতর থেকে কর্ম ফুটে ওঠে। এইটিই যথাক্রমে কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্মের 'দর্শন'। এই স্বচ্ছ শান্ত উজ্জ্বল দর্শন পিছনে থাকলে সমগ্রভাবে কর্ম করা আমাদের সম্ভব হয়। তখনই আমরা কৃৎস্নকর্মকৃৎ। আমাদের দর্শন তখন 'বুদ্ধি' বা প্রজ্ঞাস্থিতির দর্শন, আমরা তখন যথার্থ কর্ম'যোগী'। এইভাবে যে কৃৎস্নকর্মের অনুষ্ঠান, তা ছাড়া আর সবই বিকর্ম।

প্রশ্ন

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের (৪।২৪-২৫) শ্লোকে আছে—'ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ব্রহ্মৈব গন্তব্যম্'-এর কথা। দৈবযজ্ঞে এবং ব্রহ্মযজ্ঞে পার্থক্য কি ? পার্থক্যটা কি ভাবনার মধ্যে ? দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায়, জ্ঞানযজ্ঞের তাৎপর্য কি ?

উত্তর

মীমাংসায় যজ্ঞের সাধারণ লক্ষণ 'দেবোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগ'। ব্যাপারটি অবশ্য প্রতীকধর্মী (Symbolical)। আসলে ত্যাজ্য দ্রব্যগুলি সবই প্রতীক—যজমানের আত্মসত্তার প্রতীক। অগ্নিতে কোন দ্রব্য আহুতি দিতে গিয়ে বলতে হয়, 'ইদং তব, ন মম'—এ তোমার, আমার নয়। আর দ্রব্যটিকে আত্মস্বরূপ বলে ভাবনা করতে হয়। সুতরাং সব দ্রব্যযজ্ঞই আসলে আত্মত্যাগ—দেবতার কাছে

নিজেকে সঁপে দেওয়া। সে-আহুতির বাহন হ'ল আত্মার সন্দীপিত অভীপ্সার আগুন।

গীতায় যজ্ঞ সংজ্ঞাটির অর্থব্যাপ্তি ঘটানো হয়েছে। বেদে যজ্ঞকে বলা হয়েছে 'কর্ম', কোথাও-বা 'সুকৃত'। সাধারণত লোকে বোঝে দেবতার উদ্দেশে আনুষ্ঠানিক কর্মই যজ্ঞ। গীতা বলছেন, তা কেন, সমস্ত কর্মই যদি দেবতার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে তা-ও যজ্ঞ। ব্রহ্মের দিকে যাবার জন্য বহুরকম 'যজ্ঞ' বিতত রয়েছে (৪।৩২; 'বিতত' মানে এখান থেকে ওখান পর্য্যন্ত প্রসারিত, তাই বেদে যজ্ঞের এক নাম 'বিতান')।

শুধু দ্রব্য দিয়ে অনুষ্ঠান দ্রব্যযজ্ঞ। কিন্তু তা নিম্নাধিকারীর জন্য, অথবা বেদবাদরতদের জন্য। গীতা তার চাইতে বড় যজ্ঞের কথা বলছেন। ভাবনাসহকারে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ—জ্ঞানযজ্ঞের প্রথম সোপান। সত্যকার জ্ঞানযজ্ঞ একটা আন্তর সাধনা। জানতে হবে, সমস্ত জীবনটাই একটা যজ্ঞ। আর তা অনুষ্ঠিত হচ্ছে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করে—ভোগৈশ্বর্য-সিদ্ধির জন্য বিশিষ্ট কোনও দেবতাকে লক্ষ্য করে নয়। তখন যজমানের লক্ষণ হল, তিনি গতসঙ্গ, মুক্ত তাঁর চেতনা সব সময় জ্ঞানে অবস্থিত। তিনি যা কিছু করেন, সমস্তের ভিতর দিয়েই নিজেকে সেই অসীমের মধ্যে ঢেলে দিয়ে একেবারে ফাঁকা হয়ে যান (৪।২৩)। একেই বলে ব্রহ্মযজ্ঞ বা জ্ঞানযজ্ঞ। তখন তিনি সর্বত্র সন্দীপ্ত ব্রহ্মস্বরূপ অগ্নিতেই ব্রহ্মকে হব্যরূপে আহুতি দেন স্বয়ং ব্রহ্ম হয়ে। সমস্ত ব্যাপারটি তখন একটি অখণ্ডব্রহ্মভাবনায় পর্য্যবসিত হয়। তাকেই বলা হচ্ছে ব্রহ্মার্পণ। তখন ব্রহ্মভাবনা আর কর্মানুষ্ঠানে কোনও বিরোধ থাকে না, তারই নাম ব্রহ্মকর্মসমাধি অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং কর্মের মধ্যে একটা সমাধান, কর্মকে ব্রহ্মে সমাহিত করা। আমাদের দেশে বহু সাধক এই ভাবের কথা বলে গেছেন—'যৎ করোমি জগন্মাতস্তদের তব পূজনম্, যে কাজই করি, তাঁরই ধ্যান ধরি, এ-জীবন তাঁরই যন্ত্র'।

এমনি করেই ব্রহ্মকে পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায়। আর ব্রহ্মকে পাওয়ার জন্যই তো সবাই সাধনা করছেন—কেউ তপ, কেউ যোগ, কেউ স্বাধ্যায়, কেউ জ্ঞানানুশীলন, কেউ প্রাণায়াম ইত্যাদি নানা রকমে নানা বিধিতে। তাঁরা সবাই যতি, সবাই সংশিতব্রত (৪।২৮)। 'যতি' কি-না সংযত, অন্তরাবৃত্ত। 'সংশিতব্রত' কি-না তাঁদের সঙ্কল্পে (ব্রতে) আছে অগ্র্যা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, তাঁরা অপ্রমত্ত। ঠিক-ঠিক ভাবে অনুষ্ঠান করতে পারলে এসবই সনাতন ব্রহ্মে মানুষকে নিয়ে যেতে পারে (৪।৩০)।

প্রশ্ন

গীতায় আছে—সনাতন ব্রহ্মকে যজ্ঞশিষ্টামৃতভোজী যাঁহারা, তাঁহারাও লাভ করিয়া থাকেন। 'যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্' (৪।৩০)। যজ্ঞাবশেষ-ভোজনের রহস্যটি কি? সব কর্মকেই তো যজ্ঞ-ভাবনায় করিতে বলা হইয়াছে গীতায়!

উত্তর

যজ্ঞের মূল কথাটি হচ্ছে আত্মাহুতি। মীমাংসা বলেন, দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগই যজ্ঞ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলছেন, এই যে আহুতি-দ্রব্য, তা হল যজমানের নিষ্ক্রয় (ransom) অর্থাৎ যজমান সোজাসুজি নিজেকে অগ্নিতে আহুতি দিতে পারেন না বলে তার বদলে পুরোডাশ প্রভৃতি আহুতি দেন। আহুতির দ্রব্য যজমানের প্রতীক। ভাবনা ছাড়া যজ্ঞ হয় না। দ্রব্যযজ্ঞে যে-দ্রব্য দেবতার উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হচ্ছে, যজমান ভাবনা করবেন, তা তিনি নিজেই।

ঘোর আঙ্গিরসের শিক্ষা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণও আমাদের এই শিখিয়েছেন যে, আমাদের সমস্তটা জীবনই একটা যজ্ঞ। দেবতার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত বিশিষ্ট কোনও অনুষ্ঠানই কেবল যজ্ঞ নয়, সব কর্মই যজ্ঞ, এই কর্মই তাঁর কাছে আত্মবলিদান। এটি দ্রব্যযজ্ঞ নয়, জ্ঞানযজ্ঞ।

দ্রব্যযজ্ঞে যা দেবতার উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হত, তার একটু অংশ প্রসাদরূপে ঋত্বিক বা যজমান গ্রহণ করতেন। এই প্রসাদের

নাম হবিঃশেষ বা ইড়া। দেবতা যা গ্রহণ করেছেন, তা অমৃত হয়ে গেছে। তাঁর প্রসাদরূপ সেই অমৃত গ্রহণ করে আমিও অমৃত হলাম। যজ্ঞশিষ্ট অমৃত ভোজনের ফলে আমি দেবতার সঙ্গে এক হয়ে গেলাম।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, 'অমুং য়জ অমুং য়জ' বলে আলাদা আলাদা দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করতে বলা হয়। কিন্তু বস্তুত সব দেবতাই আত্মারই বিসৃষ্টি। সুতরাং আত্মাই একমাত্র দেবতা। অথবা ব্রহ্মই একমাত্র দেবতা।

অতএব ইষ্ট যিনিই হ'ন না কেন, তিনিই ব্রহ্ম। শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের বিষ্ণু—সবাই ব্রহ্ম, সবার উপাসনার মূল কথা আত্মাহুতি। ইষ্টকে বলি, আমি আমার নিজেকে দিলাম, তুমি গ্রহণ কর। তিনি আমাকে গ্রহণ করেন, স্বীকার করেন। অন্তরে তাঁর দ্বারা সম্ভুক্ত হয়ে আমি তাঁর সঙ্গে একাকার হয়ে যাই। বাইরে জীবন চলতে থাকে তাঁর সেই সম্ভোগের আনন্দ নিয়ে। জীবন তখন তাঁর প্রসাদ, তাঁর যজ্ঞের হবিঃশেষ। তা অমৃত। এমনি করে অন্তরে-বাইরে আমরা তাঁকেই পাই—যিনি সনাতন ব্রহ্ম।

প্রশ্ন

গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে (৫।২) আছে—'তয়োস্ত কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে।' কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগের বিশেষত্বের কথা ভগবান কেন বলিলেন? অর্জুনের বিষাদ-যোগ বা নির্বেদ-সন্ন্যাসের ভাব কি তদানীন্তন যুগের মনোভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল? ঈশোপনিষদে কিন্তু পাই বিপরীত মনোভাবের কথা—শতবর্ষ কর্ম করিয়া বলিষ্ঠভাবে জীবন-যাপনেরই কথা।

উত্তর

কর্মসন্ন্যাস আর কর্মযোগের মধ্যে যে বিরোধ, তার একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। কর্মসন্ন্যাস বা অকর্ম (২।৪৭; তু. অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি য়ঃ, স সন্ন্যাসী চ য়োগী চ ন

নিরগ্নির্ ন চাক্রিয়ঃ ৬।১) হল মুনিধর্ম, আর কর্মযোগ ঋষিধর্ম। মুনি আর ঋষি উভয়েই আর্য, কিন্তু মুনি অবৈদিক আর ঋষি বেদপন্থী। গীতা বেদপন্থার সমালোচক হয়েও (তু. ২।৪২-৪৬) মূলত বেদপন্থী (তু. ১৫।১৫)। তাই কর্ম-সন্ন্যাসের সীমিত উপযোগিতা স্বীকার করেও গীতা কর্মযোগের উপরেই জোর দিয়েছেন। তার কারণ শ্রীকৃষ্ণ আগেই ব্যাখ্যা করে বলেছেন : (১) কর্ম না করে কেউ এক মুহূর্ত থাকতে পারে না, কর্ম করব না বললেও প্রকৃতি মানুষকে কাজ করিয়ে নিবেই (৩।৫); (২) কর্ম না করলে শরীরযাত্রাও তো চলবে না (৩।৮) ; (৩) লোকসংগ্রহের জন্যও কর্ম করা উচিত—যেমন ভগবান স্বয়ং করছেন, জনকাদি রাজর্ষিরা করেছেন (৩।২৩-২৬); (৪) কর্ম বন্ধনের কারণ, এ ধারণা ভুল, কেননা, যজ্ঞবুদ্ধিতে কর্ম করলে তা কখনও বন্ধনের কারণ হতে পারে না (৩।৯) ; (৫) 'কর্মপ্রবৃত্তি আসছে তাঁর থেকেই, যিনি সবকিছু চেয়ে আছেন'—এই বুদ্ধিতে কেউ যদি তার কর্মকে ঈশ্বরার্চনায় রূপান্তরিত করে, তাহলে তাতেই তার সিদ্ধিলাভ হয়—একথা গীতার শেষেও বলেছেন (১৮।৪৬)। আরও বলেছেন, শুধু কর্ম ছেড়ে দিলেই নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি হয় না ; সব কর্মই সদোষ ; কিন্তু অসক্তবুদ্ধি হয়ে কর্ম করতে-করতেই মানুষ নৈষ্কর্ম্যে উত্তীর্ণ হতে পারে (৩।৪, ১৮।৪৮-৪৯)।

কর্ম-সন্ন্যাস আর কর্মযোগের এই বিরোধের আভাস ঋক্-সংহিতাতেও পাওয়া যায়। কর্ম-সন্ন্যাসবাদের একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল 'কীকট' বা আধুনিক বিহার, যেখানে বুদ্ধদেবের এবং জৈন প্রভৃতি তীর্থঙ্করদের আবির্ভাব হয়েছিল। ব্রহ্মসূত্রে আভাসিত সাংখ্য আর বেদান্তের বিরোধের মূলেও ওই মুনিপন্থা আর ঋষিপন্থার দ্বৈধ। শ্রীকৃষ্ণ দু'য়ের মধ্যে সমন্বয় আনতে চেয়েছিলেন। তাঁর উপদেশ হল, 'কাজ ছেড়ো না, কিন্তু অকর্তা হয়ে এবং ফলাকাঙ্ক্ষা ছেড়ে "মৎ-কর্ম পরম" হয়ে কাজ করে যাও।' এটাই কর্মযোগ এবং গীতার বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন

গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে (৫।৫) আছে—'যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।' সাংখ্যপথের সাধকের প্রাপ্য স্থান এবং যোগপথের পথিকের প্রাপ্য এক হয় কেমন করিয়া? এখানে কি কপিলের সাংখ্যমতের কথা বলা হয় নাই? সেশ্বর-সাংখ্য পাতঞ্জলের লক্ষ্য এবং নিরীশ্বর-সাংখ্যমতের লক্ষ্য তো এক হইতে পারে না। 'একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ'—ইহা সম্ভবপর হয় কেমন করিয়া?

উত্তর

সাংখ্য এবং যোগ—এই দুটি সংজ্ঞা প্রচলিত অর্থে গীতায় ব্যবহৃত হয়নি। সাংখ্য নিরীশ্বর আর যোগ সেশ্বর—এই প্রচলিত উক্তি সাংখ্যসূত্র আর যোগসূত্রের বেলায় প্রযোজ্য। সূত্রগুলিতে সাংখ্য ও যোগের ন্যায়সম্মত (logical) উপস্থাপনা পাওয়া যায়। তাতে অনেক খণ্ডন-মণ্ডনের কথা আছে (বিশেষত সাংখ্যসূত্রে) যা মরমীয়া অনুভবের সঙ্গে খাপ খায় না। গীতা যে সাংখ্য ও যোগের কথা বলছেন, তা শ্রুতি ও স্মৃতি-সম্মত। যোগে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ আছে বলেই তা সেশ্বর-দর্শন, একথা কতকটা উপরভাসা। যোগসূত্র একটা সার্বজনীন অধ্যাত্ম-প্রয়োগবিজ্ঞানের শাস্ত্র। উপাসনায় ঈশ্বর যখন স্বীকৃত, তখন তাঁর স্থান পতঞ্জলিকে করতেই হয়েছে সাধনার বিজ্ঞানসম্মত বিবৃতি দিতে গিয়ে। কিন্তু লক্ষণীয় তাঁর ঈশ্বর প্রণববাচ্য পুরুষবিশেষ। তিনি আমাদের বিপর্যয়শূন্য বোধের বিষয়। তিনি স্রষ্টা, একথা পতঞ্জলি বলেননি। তাঁর কর্ম জগৎ-সৃষ্টি কি-না বোঝা যায় না, কিন্তু গুরুগিরিই তাঁর শাশ্বত কর্ম। সুতরাং যোগ সেশ্বর কোন্ অর্থে এটি তলিয়ে বোঝা দরকার।

শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্য আর যোগ বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন, তা তিনি গোড়াতেই স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন—সাংখ্যবুদ্ধি আর যোগবুদ্ধির কথা বলে। এক অবিনাশিতত্ত্ব 'যেন সর্বমিদং ততম্'—এই জ্ঞান হল সাংখ্যবুদ্ধি (২।১৭; তু. ১৮।৪৬, সেখানেও এই তত্ত্বের উল্লেখ আছে)। এই বুদ্ধির ফল হল অশোক এবং

অবিকম্প হওয়া (২।৩০-৩১), নির্দ্বন্দ্ব নিত্যসত্ত্বস্থ নির্যোগক্ষেম এবং আত্মবান্ হওয়া (২।৪৫)। আর যোগবুদ্ধি হল ওই সাংখ্যবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে অসঙ্গ এবং নির্দ্বন্দ্ব হয়ে কর্ম করা (২।৪৮)। যিনি সাংখ্যে প্রতিষ্ঠিত, তিনি সমত্বে প্রতিষ্ঠিত। এই সমত্বকে ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ করাই হল যোগ বা বুদ্ধিযোগ (২।৪৭-৫০)। সাংখ্যের ফল যেমন এক অবিনাশি সর্বগত তত্ত্বে বিশ্রাম, যোগের ফলও তেমনি জন্মবন্ধবিনির্মুক্ত অনাময়পদে অবস্থান (২।৫১)।

সাংখ্য শব্দের অর্থ হল সম্যক্ খ্যাতি বা জ্ঞান। এই সম্যক্ জ্ঞান পাকা হয় যোগে। বিবিক্তসেবী হয়ে সমাধির দ্বারা সাংখ্যবুদ্ধি অর্জন করা সম্ভব, কিন্তু সে-বুদ্ধি স্থির হল কি-না তার পরীক্ষা দিতে হবে ব্যুত্থানেও সমাধিকে প্রবর্তিত করে। তা-ই হল স্থিতপ্রজ্ঞের সমাধি (২।৫৪), যার মধ্যে সাংখ্য আর যোগ এক হয়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র ঘটাচ্ছেন এই স্থিতপ্রজ্ঞের সমাধিবীর্যকে আশ্রয় করে।

প্রশ্ন

'স্বভাবস্তু প্রবর্ততে'—গীতার (৫।১৪) পঞ্চম অধ্যায়ের চৌদ্দ শ্লোকটির রহস্য কি? অনাদি-অবিদ্যাজনিত পূর্ব-সংস্কারটা কা'র? প্রথম-সংস্কার এল কোথা হতে? 'অনাদি' শব্দটিই কি এর উত্তর? কৌষিতকী উপনিষদে আছে—'এষ এব সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যঃ উন্নিনীষতে, এষ এবাসাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য অধোনিনীষতে।' সাধু কর্ম এবং অসাধু কর্মের প্রবৃত্তিদাতা কে? ঈশ্বর লোকের কর্তৃত্ব কর্ম বা কর্মফল-সম্বন্ধ কিছুই সৃষ্টি করেন না। অনাদি অবিদ্যাজনিত পূর্বসংস্কারই ঈশ্বরাধীনে কর্তৃত্বাদিরূপে প্রবর্তিত হয়। কথাটা কিন্তু বুঝতে পারলেও সংশয় যেন থেকে যাচ্ছে। স্বভাবের প্রবর্তন বলতে কি বুঝব? স্বভাবস্রষ্টা জীব, না ঈশ্বর? ঈশ্বর তো উদাসীন, তবে তাঁর কর্মটা কি? স্বভাব বিশ্লেষণ করলে আমরা কি পাই? স্বভাবেরই যদি প্রাধান্য, তবে ঈশ্বর-স্বীকৃতির প্রয়োজন কি? গীতার এই শ্লোকটির রহস্যার্থ প্রাঞ্জলভাবে ব্যক্ত করুন।

উত্তর

'স্বভাবস্তু প্রবর্ততে'—কথাটা সাংখ্যসম্মত। সাংখ্যের পুরুষ স্রষ্টা নন, তিনি 'ন সৃজতি'। সৃষ্টি কেউ করে না, সৃষ্টি হয়ে চলছে। সাংখ্য তাকে বলছেন প্রকৃতির নিত্যপরিণাম। স্বভাবের প্রবর্তন হল প্রকৃতিরই পরিণাম। তিন গুণের একটা ছকবাঁধা লীলা চলছে। তার ফলে ভোগও হতে পারে, আবার অপবর্গও হতে পারে। জীবের যখন যে-রকম অভিমান, সে তখন তার আত্মপ্রকৃতিকে সেইভাবে চালায়। এটাই তার স্বভাবের প্রবর্তন। এই প্রবর্তন হতে কর্তৃত্ব, কর্ম এবং কর্মফল-ভোগ দেখা দেয়। ভোগ করে অবশ্য জীবই।

কিন্তু এই জীবের মধ্যে যে প্রভু (৫।১৪) আছেন, বিভু (৫।১৫) আছেন, অর্থাৎ সর্বগত অথচ স্বতন্ত্র যে-পুরুষ আছেন, জীবের ভোগ-দ্বারা তিনি পরামৃষ্ট হন না। এই অপরামৃষ্ট পুরুষবিশেষকে জীব যখন অনুভব করে, তখন তারও অবস্থা এই হয়—স্বভাবের প্রবর্তনের সঙ্গে তার কোনও যোগই থাকে না। যা হবার তা হচ্ছে, সে কেবল উপদ্রষ্টারূপে দেখে যাচ্ছে।

এই যে পুরুষের তটস্থ অবস্থা, এটি হল বিজ্ঞানের প্রথম ধাপ। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো, গীতা 'ঈশ্বর' শব্দ ব্যবহার করেননি। ঈশ্বর কিন্তু সর্বভূতের হৃদ্দেশে থেকে তাদের যন্ত্রারূঢ়ের মত ভ্রমণ করান তাঁর মায়াশক্তিতে (১৮।৬১)। তা-ই যদি হয়, তাহলে কি দুটি ঈশ্বর? তা নয়। একই ঈশ্বর—কিন্তু তাঁর দুটি ভাব। তিনি সবকিছু করে বা করিয়েও কিছুই করছেন না (তু. ৪।১৩, সেখানে ভগবান কর্তা হয়েও অকর্তা)। দুটি ভাব পরস্পরবিরুদ্ধ হয়েও তাঁর মধ্যে একসঙ্গে থাকতে পারে। আমরা যখন 'যোগস্থ' হয়ে কর্ম করি, তখন আমরা 'করেও করি না', আবার 'না করেও করি'; আর তখনই আমরা 'কৃৎস্নকর্মকৃৎ' (৪।১৮)।

মনের ওপারে বিজ্ঞানভূমিতে না পৌঁছলে এ-অবস্থাটি বোঝা যায় না। মন সব সময় দ্বিধাগ্রস্ত—সে হয় কর্তা (তখন সে অকর্তা

নয়), নয়তো অকর্তা (তখন সে কর্তা নয়)। দুটা এক সঙ্গে হওয়া যায় কি করে তা সে বোঝে না। কিন্তু ঈশ্বরের মনও কি তা-ই হবে ? মনে কর, আমি কর্তা, আর তুমি অকর্তা। সংসারে এমন বহু কর্তা আর অকর্তা আছে। তারা আছে ঈশ্বরে। তাহলে ঈশ্বর তাদের মধ্য দিয়ে যুগপৎ কর্তা এবং অকর্তা। কিন্তু আমরা মন দিয়ে কি তা ধারণা করতে পারি ?

এখন কর্তৃত্ব আছে বিশ্বে, আর অকর্তৃত্ব আছে বিশ্বাতীতে। যতটুকু সৃষ্টির এলাকা, তারই মধ্যে প্রকৃতির পরিণাম চলছে। কিন্তু ঈশ্বর তো সৃষ্টিতে নিঃশেষিত নন। জগৎ তাঁর একাংশে মাত্র স্থিত (১০।৪২)! বেদের ভাষায়, তাঁর একপো' জগৎ, আর তিনপো' 'অমৃতং দিবি'। সেখানে কর্তা কর্ম কর্মফল কিছুই নাই। আর এই যে ঈশ্বরের পরম ভাব, তা কিন্তু এখানেও অনুস্যূত। বরং তিনি ফাঁকা হয়ে আছেন বলেই তাঁর একপাদ সৃষ্টির উল্লাসে উপচে উঠছে। এইটি সৃষ্টির রহস্য, জীবনের রহস্য—সাধনারও রহস্য।

এখন তোমার প্রশ্নের জবাব দেওয়া চলে। সাধু-অসাধু কথাগুলিই দ্বৈতবাসিত মনের কথা। অদ্বৈততত্ত্বে সাধু-অসাধু বলে কিছুই নাই। আছে শুধু শক্তিস্পন্দ। সেই স্পন্দ দ্বৈতের জগতে নেমে এল—অবশ্য ঈশ্বরেরই ইচ্ছায়। সুতরাং সমস্ত কর্মের প্রবৃত্তিদাতা শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরই। কিন্তু ঈশ্বরের যে-স্বাতন্ত্র্য (freedom) তার আলোকপাত হয় জীবচৈতন্যেও। তখন জীব মনে করে 'আমি ঈশ্বর'। এই মনে করাটাকে আমরা বলি 'অহংবুদ্ধি'। স্বভাব যখন অপরা-প্রকৃতির কবলিত, তখন জীব 'আমি কর্তা' বলে, স্ব-ভাবের প্রেরণায় কর্ম বেছে নেয় ; কিন্তু কর্মফলের উপর তার কোনও এক্তেয়ার থাকে না। আর তাইতে সে দুঃখ পায়। দুঃখ পেয়ে দুঃখ হতে সে অব্যাহতি চায়। তখন খোঁজ পড়ে ঈশ্বরের।

আগেই বলেছি, ঈশ্বরের দুটি ভাব; তিনি অকর্তা আবার তিনি কর্তা। জীব দুটি ভাবই নিতে পারে। হয় সে ঈশ্বরের মত অকর্তা হতে পারে (এ-ই গীতোক্ত সাংখ্যবুদ্ধি), অথবা সে ঈশ্বরের মতই অকর্তা হয়েও কর্তা হতে পারে (এটা হল যোগবুদ্ধি)। দুটাতেই যে কর্মবন্ধন হতে মুক্তি হতে পারে, একথা গীতা আগেও বলেছেন।

এখন বলতে পারি, ঈশ্বর অকর্তা এই দৃষ্টিতে স্বভাবের প্রবর্তন হল প্রকৃতির পরিণাম। এটা অনাদিকাল ধরে চলছে—যেন escalator এর মত। চাকা ঘুরছেই। তুমি তাতে বাঁধা পড়তে পার, নাও পার—যদি চক্রনাভিতে থাক। আবার চক্রবর্তীও হতে পার। যখন বাঁধা পড়বে, তখন মনে হবে চাকার ঘূর্ণি বা স্বভাবের প্রবর্তন যেন তোমার গরজেই হচ্ছে। কথাটা অর্ধসত্য। আপাতদৃষ্টিতে স্বভাবের প্রবর্তন আমার গরজে; কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তা-ও ঈশ্বরেচ্ছায়।

স্বভাবের প্রাধান্য অথবা প্রকৃতির নিত্যপরিণামকে স্বীকার করে তুমি ঈশ্বরকে স্বচ্ছন্দে বাদ দিতে পার। তখন তুমি প্রবৃত্তির উদাসীন দ্রষ্টা মাত্র। এতেও মুক্তি হতে পারে। কিন্তু সাধনার পরিপূর্ণ কৃতার্থতা এতে আসে না—আসে এর পরের ধাপে। যখন দেখি, প্রকৃতির যন্ত্রটা তিনিই ঘোরাচ্ছেন এবং আমি তার নিমিত্ত হয়ে কাজ করে যাচ্ছি, তখন আমি একদিকে 'করছি' আরেকদিকে তিনি করাচ্ছেন বলে করছি, অতএব 'করছি না'।

প্রশ্ন

'পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ' (৫।১৮), এই সমদর্শী কথাটির তাৎপর্য কি? ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গরু, হস্তী ও কুকুরে জ্ঞানিগণ সমদর্শী হইয়া থাকেন। 'যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ', 'নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম'—গীতার (৫।১৮-১৯) এই কয়টি শ্লোকে সমত্বের উচ্চ প্রশংসা দেখিতে পাই। সমদৃষ্টি বা সমত্ব রক্ষার উপায় বা সাধনা কি? সমভাবই তো ব্রহ্মভাব? আকাশচিত্ত না হইলে কি সাধক সমভাবাপন্ন হইতে পারেন?

উত্তর

সমদর্শনের কথাটা খুব পরিষ্কারভাবে বোঝানো হয়েছে এই শ্লোকে—যোগযুক্তাত্মা হয়ে আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আত্মায় যিনি দর্শন করেন, তিনি সর্বত্র সমদর্শী (৬।২৯)।

আত্মাতে এমনি করে দেখাও যা, তাঁর মধ্যে সবাইকে এবং সবার মধ্যে তাঁকে দেখাও তা—একথা পরের শ্লোকেই আছে।

আর আত্মাতে কি করে ওই রকম দর্শন হয় তার সবিস্তার সাধনার কথা আছে সমদর্শন শ্লোককয়টিতে (৬।২৪-২৮)। মোট কথা, মনকে আত্মসংস্থ করে আর কিছু চিন্তা করবে না। এমনি করে প্রশান্তমনা হলে ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত অত্যন্ত সুখ আপনা থেকেই জাগবে। মহাশূন্যে যেন আলোর কমল ফুটবে। ওই ভাবটি নিয়ে যখন যোগী আবার জগতে নেমে আসবেন তখন তাঁর সমদর্শন হবে। সবাইকে তখন তিনি দেখবেন যেন ব্রহ্ম বা আত্মার সমুদ্রে বিচিত্র বর্ণের একেকটি বুদ্‌বুদ্। ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর, চণ্ডাল—সবাই প্রশান্তমনা যোগীর অন্তরে উদ্বেল ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত অত্যন্ত সুখের সমুদ্রে বীচিভঙ্গের মত। ব্রাহ্মণ বড়, চণ্ডাল আর তার কুকুর ছোট, অথবা ব্রাহ্মণের গোধন বড়, ক্ষত্রিয়ের হস্তিসম্পদ তার চাইতে খাটো—এসব ভেদবুদ্ধি তার থাকে না।

কিন্তু তা বলে তিনি ব্যবহারে সাম্য এনে অজ্ঞদের বুদ্ধিভেদও জন্মান না। সমদর্শন হলেই সমব্যবহার হবে—এটা কিন্তু ধর্ম নয়। সমদর্শন পুরুষের ধর্ম, আর প্রকৃতির ধর্ম হচ্ছে যথাযোগ্য উচ্চাবচ ব্যবহার, যাতে সবার মধ্যে পুরুষ ফুটে উঠতে পারেন। তাইতে চণ্ডালও দ্বিজশ্রেষ্ঠ হবেন—কিন্তু স্বভাবের ও স্বধর্মের অনুবর্তনের ফলে। নইলে কিন্তু ধর্মসঙ্কর উপস্থিত হবে।

প্রশ্ন

'যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখয়োনয় এব তে'—গীতার (৫।২২) এই শ্লোকটি পড়িয়া মনে হয়, বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শজনিত সুখ মাত্রেই

দুঃখজনক। বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ তো স্বাভাবিক। তাহা হইলে মনকে নির্বিষয় করিবার উপায় কি? 'শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং কামক্রোধোদ্ভবং বেগং'—কাম-ক্রোধের বেগ সহ্য করা অর্থে কি বোঝায়? বৃত্তির প্রবেগে চালিত হইয়া কার্য না করাই কি সহনশীলতা?

উত্তর

তোমার প্রশ্নের উত্তর ওই শ্লোকটির আগে-পরেই রয়েছে। দু'রকম স্পর্শ আছে—একটি বাহ্যস্পর্শ, যাকে অন্যত্র বলা হয়েছে মাত্রাস্পর্শ (২।১৪); আরেকটি হচ্ছে ব্রহ্মসংস্পর্শ (৬।২৮)। দুয়েই বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যোগ হয়। এই যোগের ফলে 'প্রাকৃত' চিত্তে রাগ-দ্বেষের উদয় হয়, আর সে-রাগদ্বেষ 'ব্যবস্থিত' অর্থাৎ যান্ত্রিক, প্রকৃতিই ঠিক করে রেখেছে—কোন্ ইন্দ্রিয়জ স্পর্শে সুখ হবে, কোন্‌টায় দুঃখ হবে। গীতা বলছেন, এই প্রাকৃত ব্যবস্থার বশীভূত হবে না (৩।৩৪)। অর্থাৎ রাগ-দ্বেষে ক্ষুব্ধ হবে না। তার জন্য তিতিক্ষা দরকার। মাত্রাস্পর্শ সম্পর্কে তিতিক্ষার কথাও আগে বলা হয়েছে—মাত্রাস্পর্শেরা আসে যায়, তুমি তাদের আসা-যাওয়ার সঙ্গে জড়িয়ে যাবে না (২।১৪)।

চিত্ত অন্তর্মুখ না হলে তিতিক্ষা সহজ হয় না। সাংখ্যবাদীরা বলেন, তিতিক্ষাই প্রমাণ করে আমাদের মধ্যে এমন একটি পুরুষ আছেন যিনি সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে। তিনিই আত্মা। অতএব বিষয়-সন্নিকর্ষেও যদি আমরা নির্বিকার থাকতে পারি, তাহলে আমরা আত্মস্থ তথা যোগস্থ হব। উপনিষদে একে বলা হয়েছে, জ্ঞান-আত্মার সাক্ষাৎকার। এই অনুভূতির পরিপাকে আত্মব্যাপ্তির ভাব আপনি এসে যায়। তখন আত্মসংস্থ মন ব্রহ্মসংস্থ হয়। সেই 'ব্রহ্মযোগ-যুক্তাত্মা' আত্মাতেই অক্ষয়-সুখ অনুভব করে—বিষয়সংস্পর্শ তখন ব্রহ্মসংস্পর্শকেই উদ্রিক্ত করে। তখন, বৈষ্ণবের ভাষায় 'যাঁহা যাঁহা দৃষ্টি পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।' এটা হেয়, ওটা উপাদেয়, এটাতে সুখ, ওটাতে দুঃখ—এই দ্বৈতবুদ্ধি তখন থাকে না। অথচ ইন্দ্রিয়ের কাজ যে তখন নিরুদ্ধ হয়ে যায়, তা নয়। ভিতরে

তখন ফোটে একটা জ্যোতি, একটা আরাম, একটা সুখ, যা বাইরের সবকিছুকে আপ্লুত আবিষ্ট এবং জারিত করে ফেলে (৫।২৪)। সুখ-দুঃখের দ্বৈতবোধ হল কামক্রোধোদ্ভব বেগ হতে জাত। ঐ বেগ আবার রজোগুণের ক্রিয়া (৩।৩৭)। ওতেই ভূমার বোধকে আচ্ছন্ন করে অল্পের বোধকে প্রবল করে। অতএব ব্রহ্মসংস্পর্শজ সুখ বা ভূমানন্দ লাভ করতে হলে বাইরের দিক থেকে যেমন তিতিক্ষা দরকার, তেমনি অন্তরের দিক থেকে কাম-ক্রোধের বেগকে সামলানো দরকার। এতেই চিত্ত অন্তর্মুখ হয়ে ক্রমে আত্মায় তথা ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন

'অভিতো ব্রহ্মনির্বাণম্'—গীতার (৫।২৬) এই কথাটির তাৎপর্য কি? 'কামক্রোধবিযুক্ত' হওয়ারই-বা উপায় কি? বেগের সঙ্গে মনকে যুক্ত না করার নামই কি বিযুক্তাবস্থা? বিযুক্ত অবস্থাটা তো অভ্যাস-সাপেক্ষ? বেগের সৃষ্টি করাই কি ঈশ্বরের কাজ, আর, নিরুদ্বেগ হওয়াই জীবের সাধ্য বা কর্তব্য? জীব ঈশ্বরেচ্ছারি সঙ্গে লড়াই করিবে কেমন করিয়া?

উত্তর

ব্রহ্মনির্বাণের প্রসঙ্গ গীতায় দুবার আছে। একবার অন্তকালে ব্রহ্মনির্বাণের কথা বলা হয়েছে (২।৭২)। জীবনে ব্রাহ্মী-স্থিতি, মরণে ব্রহ্মনির্বাণ। এখানে বলা হচ্ছে ব্রাহ্মী-স্থিতিতে ব্রহ্মনির্বাণের কথা। ব্রহ্মনির্বাণ আর ব্রাহ্মীস্থিতি ওতপ্রোত—এইটি গীতার বিশেষ শিক্ষা। ব্রহ্মনির্বাণে সব ফুরিয়ে গেল, তা-ই নয় শুধু— তাথেকে সব উৎসারিত হচ্ছে এ-ও সত্য। অথচ সে উৎসারণে অটল অটলই থেকে যাচ্ছেন। একটু পরেই বলা হচ্ছে 'পরমা শান্তি হচ্ছে নির্বাণ, কিন্তু তা আমাতেই সংস্থিত' (৬।১৫)।

এই ব্রহ্মনির্বাণের অবস্থাটি কি তা একটু আগেই বলা হয়েছে— ওটি 'অন্তঃসুখ, অন্তরারাম, অন্তর্জ্যোতি'র অনুভব। সুখ মনের, সমস্ত বৃত্তির সৌষম্যজনিত ব্রহ্মসংস্পর্শের সুখ (৬।২৮); আর আরাম

প্রাণের—ওটি হল একটি সমরস-প্রত্যয়, যেমন ভাবাবেশে হয়ে থাকে। উপনিষদে ব্রহ্মকে 'আকাশ-শরীর সত্যাত্ম প্রাণারাম মন-আনন্দ' বলা হয়েছে। ব্রাহ্মী-স্থিতিতে ব্রহ্মনির্বাণের এটি সুন্দর বর্ণনা।

কাম ব্রহ্মশক্তিরই খেলা। পুরুষ যখন অশক্ত বা শক্তির কবলিত, তখন কাম একটা বেগ—যাকে সামলানো পুরুষের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। এটি প্রাকৃত পুরুষের বেলায়। কিন্তু ব্রহ্মে যে কাম, তা হল বেদের ভাষায় 'মনসঃ প্রথমং রেতঃ'—মনের সেই প্রথম প্রবেগ, যা হতে বিসৃষ্টি। এই কাম তন্ত্রে কামকলা। প্রাকৃত কামের সঙ্গে তফাৎ করবার জন্য উপনিষদে ওই কামকে বলা হয়েছে সঙ্কল্প। 'কাম' desire—অশক্তের ইচ্ছা ; আর 'সঙ্কল্প' will—শক্তিমানের সিসৃক্ষা। কাম বাইরে থেকে আসে, মনকে চঞ্চল করে ; কিন্তু ঈপ্সিত বস্তু পাওয়ার সামর্থ্য হয়তো থাকে না তখন। আর সঙ্কল্প ভিতর থেকে উৎসারিত হয়, গাছে ফুল ফোটার মত।

অতএব ব্রহ্মে সঙ্কল্প আছে, কিন্তু প্রাকৃত অর্থে কাম নাই। প্রাকৃত কাম যখন ব্যাহত হয়, তখন ক্রোধের সৃষ্টি হয় (২।৬২)। তার বেগও সামলানো কঠিন। কিন্তু যিনি বৃহতের সঙ্গে যুক্ত, শক্তি তাঁর মধ্যে সৌষম্য সৃষ্টি করে—বৈষম্য নয়। সেই সৌষম্যই 'প্রসাদ' 'আরাম' 'সুখ' (ব্রহ্মসংস্পর্শজ) সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় প্রাকৃত কাম থাকে না। কিন্তু তার যা লক্ষ্য অর্থাৎ সুখভোগ তা অনায়াসে সিদ্ধ হয়। তখন বিষয় উপলক্ষ্য মাত্র। যে কোনও বিষয়ের মাত্রাস্পর্শ তখন রূপান্তরিত হয় ব্রহ্মসংস্পর্শে। আর তাইতে অনুভব হয়, ব্রহ্মনির্বাণ প্লাবনের মত চারিদিক থেকে (অভিতঃ) এসে চেতনাকে আপ্লুত করে রেখেছে।

এ অবস্থা যে অভ্যাসসাপেক্ষ, তা বলা বাহুল্য। বেগের সৃষ্টিও ঈশ্বর করেন, আবার নিরুদ্বেগ হবার পথও তিনিই বাৎলে দেন—এই খেলা চলছে। সুতরাং ব্যাপারটা ঠিক লড়াই নয়। যেমন মুশকিল আছে, তেমন আসানও আছে।

প্রশ্ন

গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের উনত্রিশ (৫।২৯) শ্লোকে আছে—'ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং', এর তাৎপর্য কি? 'সর্বলোকমহেশ্বর' বলিয়াই আবার 'সুহৃদং সর্বভূতানাম্' বলা হইয়াছে। এখানে ঐশ্বর্য-মাধুর্যের যুগপৎ ইঙ্গিত দেওয়া হয় নাই কি? মহেশ্বররূপে এবং সুহৃদ্‌রূপে ভগবানকে জানাই শান্তিলাভের একমাত্র উপায়—ইহাই তো গীতার প্রবক্তার অভিপ্রায়? বিভূতিযোগে ভগবানকে পাইলেও প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মেটে না, সুহৃদ্‌রূপে পাওয়া চাই তাঁহাকে!

উত্তর

যজ্ঞ আর তপ অতি প্রাচীন দুটি সাধন-পন্থা। আগেরটির অনুষ্ঠান করতেন ঋষিরা, আর পরেরটির অনুশীলন করতেন মুনিরা। যজ্ঞের মূলে আছে দেববাদ—দেবোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগই যজ্ঞ, এরকম লক্ষণ মীমাংসায় আছে। আর তপের মূলে আছে আত্মবাদ। পতঞ্জলির ক্রিয়াযোগেরও একটি অঙ্গ হল 'তপঃ'। দেববাদ থেকে ব্রহ্মবাদ আর আত্মবাদ থেকে সাংখ্য। আবার গৃহস্থের সাধন যজ্ঞ, বানপ্রস্থীর সাধন তপঃ—এও বলা চলে। তখন বাইরের যাগ অন্তর্যাগ হয়ে যায়। এসব সাধনার ইঙ্গিত উপনিষদে আছে।

যজ্ঞ আর তপস্যা ছাড়া সাধন নাই। এখন যজ্ঞ পর্যবসিত হয়েছে পূজায়, আর তপ যোগে। দুটিকে ওতপ্রোত করেও সাধন চলে।

সাধনা মাত্রেই কর্ম। আমি কর্ম করব তাঁর উদ্দেশে। যজ্ঞ করব সেই যজ্ঞেশ্বরের উদ্দেশে; তপ করব তাঁকেই পাবার জন্য। সাধনাজনিত যে আনন্দ বা প্রসন্নতা, তা তাঁকেই অর্পণ করব—এই বুদ্ধিতে যে আমার কেবল কর্মেই অধিকার আছে, ফলে অধিকার নাই। ফলের ভোক্তা তিনিই। তিনিই আমার সাধন-জনিত সিদ্ধি। আমি আমার জন্য কিছুই করছি না, করছি তাঁর জন্যই। যজ্ঞ ও তপস্যার দ্বারা যে নিজেকে সম্পন্ন করছি, তা তাঁরই সম্ভোগের জন্য।

এই হচ্ছে সাধনার বেলায় তাঁর ভাবনা। সেই ভাবনা পুষ্ট হয় জ্ঞানে। সে-জ্ঞান তাঁর স্বরূপ-জ্ঞান। তাঁর স্বরূপ কি? না, যেমন তিনি বিশ্বের ঈশ্বর, তেমনি আবার ব্যক্তির সুহৃৎ। লোকে-লোকে তিনি লোকেশ্বর, আবার ভূতে-ভূতে অন্তর্যামী সুহৃৎ। ঐশ্বর্যে প্রকাশ পায় তাঁর মহিমা, আর অন্তর্যামিত্বে প্রকাশ পায় তাঁর প্রেম, তাঁর আনন্দ। কবির ভাষায়, 'রাজার রাজা হয়ে তুমি আমার হৃদয় লাগি, ফিরছ কত মনোহরণ বেশে।' ঐশ্বর্যে আর মাধুর্যে কোনও বিরোধ নাই। গোড়ায় ঐশ্বর্য বা মহিমার জ্ঞান না থাকলে ভক্তি উর্জিতা হয় না, একথা নারদও বলেছেন। ক্রমে প্রেমের গভীরতায় ঐশ্বর্য বিগলিত হয়ে যায়। কিন্তু তাবলে যে ঐশ্বর্য থাকে না, তা নয়। তখনও 'তোমার গরবে গরবিণী হম্।'

ফলিতার্থ, আমার বহির্যাগ আর অন্তর্যাগ দুয়েরই ভোক্তা তুমি—তুমি আমার বিশ্বে, তুমি আমার হৃদয়ে।

প্রশ্ন

গীতায় ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে (৬।১) সন্ন্যাসী এবং যোগীর যে পরিচয় পাই, তাতে আমাদের যে ধারণা (যেমন সন্ন্যাসী হইবে গৃহত্যাগী এবং কাম-কাঞ্চনত্যাগী, যোগী—প্রাণায়ামপরায়ণ) তাহার সঙ্গে তো কোন সামঞ্জস্য দেখি না। কর্ম্মফলত্যাগীই তো গীতার মতে যোগী এবং সন্ন্যাসী? নিরগ্নি এবং অক্রিয়কে তো সন্ন্যাসী বা যোগী বলা হয় নাই। নিরগ্নি এবং অক্রিয় কথাটার তাৎপর্য কি?

উত্তর

আর্যদের মধ্যে যাঁরা দেববাদী, তাঁদের বলা হত 'ঋষি', আর যাঁরা আত্মবাদী, দেবতা মানতেন না, তাঁরা ছিলেন 'মুনি'। আমরা যে-যোগপন্থার বিবরণ পাতঞ্জলদর্শনে পাই, তা প্রধানত মুনিদের দ্বারা উদ্ভাবিত। এই মুনিদের উল্লেখ ঋক্-সংহিতাতেও আছে। এই অদেববাদী মুনিরা বৈদিক ক্রিয়াকর্মের সমর্থন করতেন না।

শাক্যমুনির দ্বারা যজ্ঞবিধির নিন্দার কথা আমরা জয়দেবের মুখেও শুনি। গীতায় এখানে এই 'অক্রিয়'দেরই যোগী বলা হয়েছে। 'কিং কৃতেন'—কর্ম করে কি হবে, এই কথা বলে বেড়াতেন বলে তাঁদের দেশের নাম হয়ে গিয়েছিল 'কীকট', এমন কথা বেদেও পাওয়া যায়। এঁরা সন্ন্যাসীও হতেন, পরিব্রাজক হয়ে ঘুরে বেড়াতেন, তখন তাঁদের বলা হত 'মস্করী'। ওই কথাটারও একই অর্থ—'মা কুরু'—কিছু করো না। পাণিনিতে এঁদের উল্লেখ আছে।

দেববাদী-আর্যরাও সন্ন্যাসী হতেন। ঋক্-সংহিতায় তাঁদের নাম হচ্ছে 'যতি'। যজুর্বেদ কর্মবেদ—এই বেদে এই যতিদের প্রতি কটাক্ষ আছে। যতিরা সন্ন্যাসী হওয়ার সময় 'আত্মন্যগ্নীন্ সমাধায়' অর্থাৎ আত্মাতে যজ্ঞাগ্নিসমূহকে সমাহিত করে ঘর ছাড়তেন। তখন তাঁদের বেদিতে অগ্নি জ্বেলে কোনও অনুষ্ঠান করার বিধি ছিল না। এঁদের বলা হত 'নিরগ্নি'। এখনও অনেক সন্ন্যাসী অগ্নিস্পর্শ করেন না—রান্নার জন্যও নয়।

শেষ পর্যন্ত অক্রিয় আর নিরগ্নির তাৎপর্য কিন্তু একই হয়ে গেল। এঁরা আনুষ্ঠানিক কর্ম ত্যাগ করলেন। এই কর্মত্যাগের উপর খুব জোর দেওয়া থেকে দেখা দিল নৈষ্কর্ম্যবাদ (গীতা ৩।৪)।

গীতা যেমন ক্রিয়াবিশেষবহুল বেদবাদের বিরোধী (২।৪২—৪৪), তেমনি আবার নৈষ্কর্ম্যবাদেরও বিরোধী। শ্রীকৃষ্ণ বলতে চান, যারা বৈদিক কর্ম করে, তারা ভোগ আর ঐশ্বর্যের আকর্ষণে ফলকামনা করেই তা করে। এদের বুদ্ধি জ্ঞানের অনুকূল হয় না। আবার যারা বাইরে-বাইরে কর্মত্যাগ করে কিংবা লোককে সব কর্ম ছাড়বার উপদেশ দেয়, তারাও ভুল করে। তারা নিজেদের সন্ন্যাসী বা যোগী বলে, কিন্তু এই সন্ন্যাস বা যোগ লক্ষ্যভ্রষ্ট। আসল কথা হল কামনাত্যাগ। তার জন্য প্রয়োজন কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ—কর্মত্যাগ নয়। তোমার যা 'কর্ম' বা কর্তব্য কর্ম, তুমি তা করে যাও। সবাই যদি কর্ম ছেড়ে দিতে চায় তাহলে সমাজ যে উচ্ছন্নে যাবে (৩।২৪)। সুতরাং

কর্মফলের উপর ভরসা না করে তোমার যা কর্তব্য, করে যাও। তবেই তুমি যথার্থ সন্ন্যাসী বা যোগী হবে। কেবল নিরগ্নি আর অক্রিয় হলেই মানুষ যোগী হয় না।

অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যার মধ্যে দ্বেষও নাই, আকাঙ্ক্ষাও নাই, তার কর্মবন্ধন হতে মুক্তি অনায়াস হয়; সে-ই নিত্যসন্ন্যাসী (৫।৩)। সন্ন্যাস যে একেবারে হেয়, তা-ও নয়। সে-ও একটা পথ। কিন্তু কর্মসন্ন্যাস হতে কর্মযোগের একটা বিশিষ্টতা আছে (৫।২)। আবার যাঁরা ক্রান্তদর্শী, তাঁরা কাম্যকর্মের ন্যাসকেই সন্ন্যাস বলেন (১৮।২)।

প্রশ্ন

'আরুরুক্ষুঃ' এবং 'যোগারূঢ়'—একটিতে 'কর্ম কারণমুচ্যতে', আরেকটিতে 'শমঃ কারণমুচ্যতে' বলার তাৎপর্য কি ? ধ্যানীর পক্ষে কর্ম ত্যাগ না করিলে কি জ্ঞান পরিপাকদশা প্রাপ্ত হয় না ?

উত্তর

যোগ যে করতে যাচ্ছে বা যোগপদে আরূঢ় হতে চাইছে, সেই সাধক হল 'আরুরুক্ষু'। সে যদি মনে করে যোগ করতে গেলে আমাকে কর্মত্যাগ করতে হবে, তাহলে সেটা তার ভুল। আগেই বলা হয়েছে, কর্ম না করাটাই যোগ নয়—কর্মফলের প্রতি স্পৃহা না রেখে ভিতরে-ভিতরে নির্দ্বন্দ্ব হয়ে যাওয়াটাও যোগ। বরং যে ওই নির্দ্বন্দ্ব ও যোগস্থ অবস্থায় পৌঁছতে চায়, তার পক্ষে কর্মই হচ্ছে প্রধান সাধন। মোটেই কোন কর্ম না করে কেউ নৈষ্কর্ম্যের অবস্থায় পৌঁছতে পারে না (৩।৪)।

যেমন আরুরুক্ষু সাধকের পক্ষে কর্ম হচ্ছে তার মুখ্য সাধন, তেমনি যোগারূঢ় সিদ্ধের পক্ষে শম হচ্ছে মুখ্য সাধন। এই শমের লক্ষণ পরের শ্লোকেই আছে : কর্ম না করা নয়, কর্মের সঙ্গে জড়িয়ে না যাওয়া, ইন্দ্রিয়ার্থ বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ভোগের আকাঙ্ক্ষাকে লালন না করা, সমস্ত রকম সঙ্কল্পত্যাগ করাই হল

শম। আমার নিজস্ব কোনও সঙ্কল্প নাই, আমি তাঁর নিমিত্ত হয়ে কর্ম করে যাচ্ছি—নিজের মতলবে নয়, এই হল সঙ্কল্প-সন্ন্যাস।

ধ্যানের পরিপাক সমাধিতে—একথা পাতঞ্জলযোগেরও। কিন্তু গীতায় যে স্থিতপ্রজ্ঞের সমাধির কথা বলা হয়েছে, তা জড়-সমাধি নয়—চেতন-সমাধি। তাতে শুধু আসন গেড়ে বসে থাকাই নয়, চলা-বলাও চলে (২।৫৪)। সুতরাং ধ্যানের পরিপাকের জন্য কর্মত্যাগ অপরিহার্য নয়।

প্রশ্ন

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা, কূটস্থ, বিজিতেন্দ্রিয়কে গীতায় 'যুক্ত' বলা হইয়াছে। লোষ্ট্র, পাষাণ ও কাঞ্চনে সমদৃষ্টি আনার উপায় বা কৌশল কি? সাধু এবং পাপীতে সমবুদ্ধিই বা আসে কেমন করিয়া (৬।৮-৯)?

উত্তর

এই শ্লোকদুটিতে সাধনার এবং সিদ্ধির একটা ক্রমের ইঙ্গিত আছে। সাধনার ক্রমটিকে নিতে হবে বিলোমক্রমে। যুক্ত হতে হলে প্রথমত চাই ইন্দ্রিয়জয়। তা সম্ভব হয় কূটস্থ হলে। 'কূটস্থ' কিন্তু নিজের মধ্যে একটা সমূর্ধ্ব অবিচল সত্তায় সবসময় স্থিত থাকা—যেমন ধর, ভ্রূমধ্যে মনটিকে ফেলে রাখা। অবশ্য এটা প্রাথমিক সাধনা। সবার উর্ধ্বে থেকে সবাইকে দেখার অভ্যাস থেকে আসে জ্ঞান। সবাইকে জড়িয়ে থাকলে কাউকে বা কিছুকে জানাও যায় না, বোঝাও যায় না। কিন্তু তটস্থ বা কূটস্থ থাকলে তা সম্ভব হয়। জ্ঞানে যেমন জ্ঞেয় বিষয় সম্পর্কে যথার্থ বোধ হয়; তেমনি জ্ঞাতৃস্বরূপ সম্পর্কেও ধারণা স্বচ্ছ ও স্থির হয়। দুনিয়াটা বুঝে ফেলে তখন আর কোন-কিছুতে আসক্তি থাকে না। আসক্তি না থাকলেই আসে অন্তরের তৃপ্তি, আত্মার তৃপ্তি। এইটি যখন পাকা হয়, তখন বিজ্ঞান। এমনি করে যে-যোগী জিতেন্দ্রিয় কূটস্থ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা তিনিই যুক্ত বা যোগারূঢ়।

গীতার যোগারূঢ় সবসময় যে তুঙ্গে বসে থাকেন তা নয়, তিনি মানুষের সমভূমিতে নেমেও আসেন। যেমন যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু সাধারণের সঙ্গে চলবার সময় যা তাঁকে সর্বসাধারণ থেকে পৃথক রাখে, সে তাঁর সমবুদ্ধি। তাঁর ইট-পাথরে অনাসক্তি আর কাঞ্চনে আসক্তি—এই দ্বৈতবুদ্ধি নাই। সব বস্তুকে তিনি তার যথাস্থানে রেখে অপক্ষপাতে সমদৃষ্টিতে দেখেন এবং সেইভাবে ব্যবহার করেন। বাইরের বিষয়ে এমনিতর সমদৃষ্টি হওয়াটা খুব কঠিন নয়—যদি বিষয়াসক্তি না থাকে। আর যিনি বিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা, তাঁর বিষয়াসক্তি থাকবেই-বা কেন? তবুও সূক্ষ্ম সংস্কার থাকতে পারে। লোহার শিকলে হয়তো বাঁধল না, কিন্তু সোনার শিকলে বাঁধে।

বিষয়ে সমদৃষ্টির চাইতে কঠিন হচ্ছে মানুষে সমবুদ্ধি আনা। মানুষের সঙ্গে আমরা হাজার পাকে জড়িয়ে আছি। এই পাক-গুলি ছাড়ানো বিষয় ছাড়ার চেয়েও কঠিন। সবাইকে কি আর একদৃষ্টিতে দেখি? কারও প্রতি অনুরাগ, কারও প্রতি বিরাগ, আবার কারও প্রতি ঔদাসীন্য, এ এসেই যায়। কিন্তু যোগীর তা আসে না। আবার সবচাইতে কঠিন হচ্ছে সাধু আর পাপীর প্রতি সমদৃষ্টি হওয়া—কেননা এখানে সূক্ষ্ম ধর্ম্মবুদ্ধির সংস্কার এসে বাধা দেয়। একটা নষ্টা মেয়ে সারদা দেবীর কাছে আসত। মা বলেই আসত। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন শুনতে পেয়ে বললেন, 'ওকে তুমি আসতে দাও কেন?' সারদা দেবী বললেন, 'তুমি এ-বিচার করতে পার। কিন্তু আমি মা। ও খারাপ বলেই ওকে আমি আসতে দেব না?' সারদা দেবীর উত্তরটাতেই আশা করি শ্লোকদুটির অর্থ প্রাঞ্জল হয়ে যাবে।

প্রশ্ন

নাসিকাগ্রে এবং ভ্রূমধ্যে—এই দুইটি স্থলে দৃষ্টি রাখার কথা গীতায় বলা হইয়াছে। অর্ধনিমিলিত-নেত্র হইলেই কি নাসিকাগ্রে দৃষ্টি পড়ে? এই দৃষ্টি কি

সর্বাবস্থায় রাখার অভ্যাস করা ভাল? ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি অর্থাৎ শিবনেত্র হওয়ার উপদেশ তো অন্তিমকালের জন্য?

উত্তর

নাসিকাগ্রের দুরকম অর্থ হতে পারে। নাকের উপর দিকটাও অগ্র, নীচের দিকটাও অগ্র। হৃদয়ে বা নাভিকন্দে ধ্যানের সময় দৃষ্টিকে সন্নত করতে হয়, আবার ভ্রূমধ্যে ধ্যানের সময় তাতে উন্নত করতে হয়। চিত্তস্থৈর্যের পক্ষে দুই-ই প্রশস্ত। যার পক্ষে যেখানে দৃষ্টিসংযম সহজ—এও একটা কথা।

দৃষ্টি রাখার উদ্দেশ্য হল মনকে অন্তর্মুখ করা। নইলে কেবল শিবনেত্র হলেই কিছু হয় না। দেহে কতকগুলি অধ্যাত্ম-প্রদেশ আছে। গীতাতে এবং উপনিষদে তিনটির উপর জোর দেওয়া হয়েছে—হৃদয়, ভ্রূমধ্য এবং মূর্ধা। প্রথমত দৃষ্টির সহায়ে মনকে ওইসব দেশে নিয়ে যেতে হয়। তারপর ওইসব জায়গায় মনের একটা সহজ স্থিতি হয়ে যায়। তখন যে-অধ্যাত্মদেশে মন থাকে, তার নীচের দিকের চেতনা স্তিমিত হয়ে যায়। অমরনাথ থেকে এসে বিবেকানন্দ বললেন, 'শিব যেন মাথায় চেপে আছেন, কিছুতেই নামছেন না।' কিন্তু তাবলে তিনি সবসময় শিবনেত্র হয়ে থাকতেন না। চেতনাকে উজানে বওয়ার জন্যও দৃষ্টিকে অতএব চিত্তকে ঊর্ধ্বগামী করতে হয়। মৃত্যুকালে তো উজিয়ে যেতেই হবে। তাই তখন হৃদয় থেকে ভ্রূমধ্য আবার সেখান থেকে মাথার উপরে উজিয়ে যাওয়ার উপদেশ আছে। কিন্তু জীবদ্দশাতেও মাথার উপরে থেকে কাজকর্ম করা চলে।

প্রশ্ন

'বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্' (৬।২১)—কথাটির রহস্য কি? মনের উপরে বুদ্ধি—এই জন্যই কি বুদ্ধিকে অতীন্দ্রিয় বলা হইয়াছে? বুদ্ধিগ্রাহ্য অথচ অতীন্দ্রিয় আত্মস্বরূপে স্থিতিলাভ করিতে হইলে ভাবনা-সমন্বিত ক্রিয়াযোগ আশ্রয় করিতে হইবে—ইহাই কি গীতার উপদেশ?

উত্তর

গীতাতে মনকেও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ধরা হয়েছে, বলা হয়েছে 'মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি' (১৫।৭)। সুতরাং অতীন্দ্রিয় বলতে বুঝতে হবে মনের ওপারে। মনের ওপারে বিজ্ঞান—এটা উপনিষদের কথা। এই বিজ্ঞান-ভূমিতে সামান্য-জ্ঞান সহজ হয়। মনের উপজীব্য হল বিশেষ-জ্ঞান। বিশেষ-জ্ঞান আসে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। একটা মানুষ দেখলাম, তখন বিশেষ একটা মানুষকেই দেখি। সে-মানুষটার কথা মনে রইল। মনের স্মৃতি এখানে বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের আশ্রিত। কিন্তু এমনি করে অনেকগুলি মানুষ দেখতে-দেখতে যে মানুষের সামান্যজ্ঞান হয় (যাকে বলা হয় মানুষত্ব), তা কিন্তু বিশেষ কোনও একটা মানুষ নয়। এই জ্ঞান সামান্যজ্ঞান, এটি বুদ্ধির আশ্রিত। একেই বলে বিজ্ঞান।

এই বিজ্ঞান মনেরও উর্ধ্বে, অতএব অতীন্দ্রিয়। যে-উদাহরণ দিলাম, সেখানে বিজ্ঞানের প্রবৃত্তি বিষয়ের দিকে। এতে ব্যবহার চলে, কিন্তু এই বিজ্ঞানের প্রবৃত্তি যদি অন্তর্মুখ হয় অর্থাৎ আমার সম্পর্কে আমি যদি অতীন্দ্রিয় সামান্যজ্ঞান লাভ করতে পারি, তখন আত্মাতে আত্মা দিয়ে (মন বা ইন্দ্রিয় নিয়ে নয়) আত্মাকে দর্শন করি। সে-দর্শনের যে-সুখ, তার তুলনা নাই। আর, এ-দর্শনের পরিপাকে কখনও প্রমাদ ঘটে না, তাই তত্ত্বদর্শন অবিচল হয়।

ভাবনা-সমন্বিত ক্রিয়াযোগ তার একটা রাজপথ বটে।

প্রশ্ন

'আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ' (৬।২৫)—এই প্রক্রিয়ার তো একটা প্রক্রম আছে? একাগ্র এবং নিরুদ্ধ চিত্তের কথাই কি এখানে বলা হইয়াছে? 'ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ'—ইহা প্রযত্নসাধ্য, না অনায়াস?

উত্তর

প্রক্রিয়াটি যোগ এবং সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ। তার লক্ষণ আর ক্রমের কথা শ্লোকটির আগে-পরে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে।

যোগ হল এমন একটি স্থিতি, যাতে গুরু দুঃখ এসেও চিত্তকে বিচলিত করে না। চিত্ত তখন অসাড় নয়; দুঃখ আর দুঃখের কারণ কি তা বুঝতে পারছি, কিন্তু তারা যেন সমুদ্রের বুকে ঢেউএর মত চলে যাচ্ছে, গভীর সমুদ্রে বিন্দুমাত্র আলোড়ন উঠছে না; দুঃখ-সংযোগ অর্থাৎ দুঃখ এবং দুঃখহেতু তখন যেন শুকনা সুপারীর খোসার মত আমা হতে আলগা হয়ে গেছে। এই অবস্থাকে বলা হয়েছে দুঃখসংযোগ-বিয়োগ। আর এরই নাম যোগ (৬।২৩)।

এই অবস্থাটি লাভ করবার জন্য প্রথমেই দরকার চিত্তের অনির্বেদ। নির্বেদ হচ্ছে মন-মরা ভাব—'হায় কিছু হল না, হায় কিছু হবে না' এই ধরনের নৈরাশ্য। এ হল তামসিকতা। একে সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। যোগের পথ ক্ষুরধার। কিন্তু এই ক্ষুরের ধার মাড়িয়েই আমি লক্ষ্যে পৌঁছবই পৌঁছব—এমনিতর একটা 'নিশ্চয়' বা রোখ থাকা চাই (৬।২৩)।

তারপর হল কাম-সঙ্কল্প ত্যাগ। ঈশ্বর-সঙ্কল্প হল সত্য-সঙ্কল্প; আর আমার নিজের মতলব হাঁসিল করবার প্রয়াস হল—কাম-সঙ্কল্প। 'আমি কিছুই করছি না, যা করবার তা তুমিই আমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছ'—ঈশ্বরের প্রতি এইরকমের নির্ভরতা হতে মতলববাজি ক্রমে দূর হয়ে যায়। 'আমার জীবনে তোমার ইচ্ছারই জয় হক'—এই ভাবকে দৃঢ়মূল করতে হবে।

তারপর উপরমের সাধনা। চিত্তের গতি প্রবৃত্তিমুখী—সে কেবল বাইরের দিকে ছুটে যেতে চায়। এই গতিকে নিরুদ্ধ করে তার মোড় ফিরিয়ে দেওয়ার সাধনা হল উপরম। এ যেমন জ্বলন্ত আগুনে আর ইন্ধন না যোগ করে ধীরে ধীরে ইন্ধন কমিয়ে আনা—যাতে শেষপর্যন্ত আগুন নিবে যায়।

ইন্দ্রিয়ের প্ররোচনা হল ইন্ধন, তা-ই মনকে বহির্মুখ করে। মন ইন্দ্রিয়ের বশ হবে না, ইন্দ্রিয় মনের বশে থাকবে—এমনি করে দুয়ের সম্পর্কের মধ্যে বিপর্যয় ঘটাতে হবে। তা সম্ভব হতে পারে মনের উর্ধ্বে যে-বুদ্ধি আছে, তাকে যদি উজ্জ্বল করে তুলতে পারি। এই বুদ্ধি সাত্ত্বিকী-বুদ্ধি। তার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে বিবেক-জ্ঞান—প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি, অকার্য আর কার্য, ভয় আর অভয়, বন্ধন আর মোক্ষের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখা (১৭।৩০)। 'আমি প্রবৃত্তি-চালিত হয়ে অর্থাৎ ঝোঁকের মাথায় এমন কিছু করে বসতে চাই না, যাতে আমি জড়িয়ে পড়তে পারি'—এই বুদ্ধি হল অভয়া। একে আবার বিশুদ্ধ-বুদ্ধিও বলা হয় (১৮।৫১)।

এই বুদ্ধি জোর ধরবে ধৃতিতে। ধৃতির অর্থ হল ধরে থাকা, রাস টেনে রাখা। সাত্ত্বিকী ধৃতি সবসময় ইন্দ্রিয় প্রাণ আর মনের রাস টেনে রাখে (১৮।৩৩)। কাজটা শুরু করতে হয় ইন্দ্রিয় থেকে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে কোন-কিছু ভাল-লাগা মন্দ-লাগার প্রাকৃত সংস্কার জড়িয়ে আছে। এই সংস্কারের বশ হতে নাই (৩।৩৪)। ইন্দ্রিয়কে ব্যবহার করছি অশুদ্ধ প্রাণ-মনের তর্পণের জন্য নয়, তাদের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য নয়—করছি আত্মার প্রসন্নতার জন্য : এই ভাব থাকলে আর ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় নির্বোধের মত বিষয়ের পিছনে ছুটতে হয় না। আত্মার প্রসন্নতা (যা আসবে ওই ভাল-লাগা মন্দ-লাগার উর্ধ্বে উঠে গেলে) হল যোগের স্বাভাবিক লক্ষণ। সাত্ত্বিকী ধৃতিতে এই যোগ অব্যভিচারিণী হয় (১৮।৩৩)।

যোগ সম্বন্ধে অনির্বেদ, নিশ্চয়, ইন্দ্রিয়-সংযম, উপরম, সাত্ত্বিকী বুদ্ধি আর সাত্ত্বিকী ধৃতির অনুশীলন—এগুলি হল যোগের বহিরঙ্গ। তার অন্তরঙ্গ হল চেতনার গভীরে একটা নিস্তরঙ্গ প্রশান্তির ভাব। এটির সংস্কার উৎপন্ন করা যেতে পারে আরোপের দ্বারা। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'আমি দীপশিখায় আরোপ করতাম।'

গীতায়ও তার কথা আছে : 'যেখানে হাওয়া নাই, সেখানে দীপের শিখা যেমন কাঁপে না, তা-ই হল যুক্ত মনের উপমা' (৬।১৯)। আরেকটি আরোপ হল নির্মল উজ্জ্বল আকাশের—হৃদয়ে যেন ওই রকম একটি আকাশ আছে, অহরহ এই ভাবনা করা। এর কথা উপনিষদে আছে। পতঞ্জলি বলেছেন, 'বীতরাগবিষয় চিত্তের' ধ্যানের কথা। অর্থাৎ মহাপুরুষদের কামনাশূন্য শুভ্র চিত্তের ধ্যান করা। এই করতে করতে বর্ষাকালের জল থিতিয়ে-থিতিয়ে যেমন নদীর বুকে চর জেগে ওঠে, তেমনি করে আমার গভীরে যে মানসোত্তর আত্মচৈতন্য সবসময় আছেই, সেইটি উপরে ভেসে ওঠে। তখন আসে ওই গভীর সমুদ্রের প্রশান্তি—উপরে ঢেউএর দোলা থাকা সত্ত্বেও। সংস্কারবশে ঢেউ যদি ওখানে আছড়ে পড়তে চায়, অমনি আত্মস্মৃতি দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে হয়। ক্রমে গভীরের প্রশান্তি উপরেও সংক্রামিত হয়। সমুদ্রের বুকে তখন আর ঢেউ ওঠে না—কুরুক্ষেত্রের ঘোর বিক্ষোভ মনে হয় যেন হাল্‌কা হাওয়ার জলতরঙ্গ।

এই ভাব ব্যবহার-দশায়। এর অভ্যাস পাকা হলে ধ্যানে বসলে মনের সমস্ত তরঙ্গ এক মুহূর্তে আপনা হতে শান্ত হয়ে যায় অনায়াসে। সেই প্রশান্ত মনে তখন জাগে ব্রহ্মসংস্পর্শের অত্যন্ত সুখ (৬।২৭-২৮)। তখন আবার বাইরে এসে সবার মধ্যে দেখি আত্মাকে বা তাঁকে অথবা আত্মা বা তাঁর মধ্যে সবাইকে (৬।২৯-৩০)।

প্রশ্ন

'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি'—গীতার এই (৬।৩০ শ্লোকটি রহস্যার্থ কি? এই দর্শনের ক্রমটি কি? বিগ্রহদর্শন আর অব্যয়-ভাব-দর্শনে পার্থক্য আছে কি? চিত্তের ক্রমসূক্ষ্মতায় অনুভূতি-পরম্পরার সুস্পষ্ট বিশ্লেষণটি বোধগম্য করাইয়া দিবেন

উত্তর

প্রথম আত্মদর্শন তারপর ঈশ্বরদর্শন—গীতা এখানে এই ক্রমটি ধরিয়ে দিচ্ছেন। কেননা, প্রথম ষট্‌কের তাৎপর্য হল—আত্মজ্ঞানে। আগে নিজেকে যদি ভাল করে জানি, তবেই তাঁকে জানতে পারব, নইলে আমার ঠাকুর হবেন আমার অবিশুদ্ধ চিত্তের কল্পনা।

এইমাত্র যা বললাম, তাথেকেই সাধনার ক্রমটি বুঝতে পারবে। প্রথমত উপরমের ফলে মনের আত্মসংস্থিতি। মনশ্চেতনা তলিয়ে যাবে বিশুদ্ধ আত্মচেতনায়। তখন শুধু আমিই আছি, আর কিছুই কোথাও নাই—এই ভাব জাগবে। অবশ্য এই 'আমি' নাম-রূপদ্বারা অবচ্ছিন্ন অহং নয়—এ আত্মবোধ, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'পাকা আমি'র বোধ। এই বোধের আবার দুটি পর্ব আছে। প্রথম চেতনা গুটিয়ে আসে একটি বিন্দুতে—তখন 'জ্ঞান আত্মা'র বোধ। এইটি সহজ হলে ওই বিন্দুটি বিস্ফারিত হবে যেন সৌরমণ্ডলে। ওটি হল 'মহান্ আত্মা'র বোধ। একটি আরেকটির অনায়াস এবং সহজ পরিণাম। এর পরেও একটা পর্ব আছে। মহাকাশে সূর্যের আলো ক্রমে স্তিমিত হয়ে যাবে, তখন আলো বা অন্ধকার, দিন বা রাত্রি কিছুই থাকবে না—থাকবে শুধু বিশুদ্ধ অস্তিত্বের বোধ। একে বলা হয় 'শান্ত আত্মা'।

বারবার এই জ্ঞান-আত্মা, মহান্-আত্মা আর শান্ত-আত্মায় অবগাহন করে তার সৌরভ নিয়ে ভেসে ওঠা—এতে ওই প্রশান্ত-মানসের (৬৷২৭) সংস্কার পাকা হয়। তখন বাইরে এসেও ওই বোধ আচ্ছন্ন হয়ে যায় না।

বাইরের আকাশ আর অন্তরের আকাশ এখন এক হয়ে গেছে। সেই আকাশে জগৎকে দেখছি—যেন সিনেমার পটে ছবির মত। মনে রাগ-দ্বেষ নাই, তাই সব দেখাতেই অক্ষুব্ধ-প্রসন্নতা—এর নাম 'সর্বত্র সমদর্শিতা' (৬৷২৯)। এই হল আত্মাতে সর্বভূতকে দেখা।

এই দেখা আরও গভীর হলে অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়। তখন পটের ছবিগুলিকে শুধু নড়তে-চড়তেই দেখি না, তারা কেন নড়ছে, কে

তাদের নাড়াচ্ছে, তাও দেখতে পাই। দেখি, আমার মধ্যে যে আত্মা সব-কিছুর দ্রষ্টা ভোক্তা এবং কর্তা বা মহেশ্বর (১৩।২৩), তিনিই রয়েছেন সবার মধ্যে। এই হল আত্মাকে সর্বভূতে দেখা।

সবার অন্তর্যামী এই যে আত্মা, ইনিই পরমাত্মা ঈশ্বর বা পুরুষোত্তম বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (১৫।১৭-১৮)।

প্রশ্ন

'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥' (গীতা ৬।৩০)—এই শ্লোকের 'মাং'কে কি ভাবে ধারণা করা হবে, 'ময়ি'রই বা ধারণা কি ? 'প্রণশ্যামি' আর 'প্রণশ্যতি'র রহস্য কি ?

উত্তর

তাঁর মধ্যে সবকে দেখা, আর সর্বত্র তাঁকে দেখা। আগে তাঁর মধ্যে দেখা, তারপর তাঁকেই দেখা। উপনিষদেও এইধরনের কথা আছে। আত্মাতে সর্বভূত দেখা, তারপর আত্মাকে সর্বভূতে দেখা, অবশেষে 'আত্মাই সর্বভূত', এই অনুভব। যতক্ষণ দৃষ্টি বহির্মুখ থাকে, ততক্ষণ দৃশ্যে আত্মাকে বা তাঁকে আমরা দেখি না। তাই প্রথম দরকার আবৃত্তচক্ষু হয়ে নিজের মধ্যে নিজেকে বা তাঁকে দেখা। তন্ময়তার ফলে বৃত্তি তদাকারাকারিত হয়ে যাবে। এটি সমাধির অবস্থা। তার পরিপাকে ব্যুত্থানেও সমাধিভাবনা থেকে যাবে, তখন দেখব তাঁর দ্বারা সবকিছু পরিব্যাপ্ত—তেন সর্বমিদং ততম্। সমুদ্রে বুদ্‌বুদ্-ফেন-তরঙ্গের মত তাঁর মধ্যেই সব ভাসছে ডুবছে। এই অনুভবের গাঢ়তায় বোধ হবে তিনিই সবকিছু হয়েছেন। যা-কিছু দেখছি, তাতে তাঁকেই দেখছি। তিনি এক মুহূর্তও আমার অনুভবের আড়াল হয়ে নাই। এইটিই 'তস্যাহং ন প্রণশ্যামি' ; প্রণষ্ট হওয়ার অর্থ—আড়াল হয়ে যাওয়া। এইভাবে আমিই যে শুধু তাঁকে দেখছি তা নয়। তিনিও আমাকে দেখছেন। তাঁর দৃষ্টিতেই আমার দৃষ্টি ফুটছে, আর তাইতে আমি তাঁকে দেখছি। যেমন মায়ের দৃষ্টিতে শিশুর দৃষ্টি খুলল, আর শিশু মাকে

দেখল। তারপর আর দৃষ্টির বিপরিলোপ ঘটল না। তিনি চেয়ে আছেন আমার দিকে; আমি চেয়ে আছি তাঁর দিকে। তাঁর দেখাই আগে, তাঁর আলোতেই আমার তাঁকে দেখা। তখন আমি তাঁর হয়ে তবে তিনি আমার। এর পরিণাম—তাঁতে-আমাতে সকল ভেদ মুছে যাওয়া। পরমদর্শনের এই শেষ বিভাবটি এখানে উহ্য।

এখন আত্মাকে যেমন করে জেনেছি সবার বাইরে এবং অন্তরে, তেমনি করে ঈশ্বরকেও জানা। অবশ্য আত্মদর্শনের পর এটি সহজ হয়; বলতে গেলে আপনি এসে যায়। যখন বিশ্বজোড়া এক অন্তর্যামীকে দেখি, দেখি কেউ যেন সর্বভূতের হৃদয়ে থেকে তাদের যন্ত্রারূঢ়ের মত ঘোরাচ্ছেন, তাঁর প্রেরণায় আমিও ঘুরছি, তখন তাঁকে আমার ঈশ্বর না বলে পারি না। আত্মজ্ঞান তখন উত্তীর্ণ হয় ঈশ্বরজ্ঞানে। তবে এ-ঈশ্বর জ্ঞানীর ঈশ্বর অতএব রামকৃষ্ণদেবের ভাষায় 'হোথা হোথা নয়—হেথা হেথা'। তিনি আমারও অন্তর্যামী, আমার বড় আপন, আমার আত্মা তিনিই। এমনি করে জ্ঞানের পরিপাকে ভক্তির উদয় হয়। তখন তাঁর মধ্যে সব দেখি—সমুদ্রের বুকে ঢেউএর মত, আবার সবার মধ্যে তাঁকে দেখি—প্রত্যেক ঢেউএ সমুদ্রকে দেখার মত।

আত্মদর্শন, ঈশ্বরদর্শন আর বিগ্রহ বা তন্বাশ্রিত ঈশ্বরদর্শন (৯।১১)—তিনের মধ্যে তর-তম ভাব আছে। পরের দর্শনটি হয় আগের দর্শনটির পরিপাকে। আগে নিজেকে জানি, সেই বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান দিয়ে বিশ্বের অন্তর্যামী ঈশ্বরকে জানি—ভাবে। এই ভাবে-জানা পরিপক্ক হলে তবে তাঁকে বিগ্রহে-জানা খাঁটি হয়। তা না হলে তাঁর পরম ভাব আর ভূতমহেশ্বর ভাব না জেনে বিগ্রহ নিয়ে মাতামাতি করলে তাঁকে 'অবজ্ঞা'ই করা হয় মূঢ়ের মত (৯।১১)।

প্রশ্ন

অভ্যাস এবং বৈরাগ্য—এই দুইটি কথার মর্ম কি (৬।৩৫)? অভ্যাসই বা কাহাকে বলে, বৈরাগ্যই বা কাহাকে বলে?

উত্তর

গীতার এই কথাটি পতঞ্জলির রাজযোগেও আছে। 'অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ'—এটি পতঞ্জলির মতে যোগের সাধারণ সাধন। সেখানে অভ্যাসের লক্ষণ বলেছেন, 'তত্র স্থিতৌ যত্নোঽ-ভ্যাসঃ'—স্বরূপে অবস্থান করবার জন্য যে-প্রয়াস, তা-ই হল অভ্যাস। অভ্যাস দৃঢ়ভূমি বা পাকা হয়, দীর্ঘকাল ধরে কোথাও ফাঁক না দিয়ে আগ্রহসহকারে যদি তার অনুশীলন করা যায়। বলতে গেলে আমাদের সমস্তটা জীবনই অভ্যাসের ফল। মিথ্যা কথা বলতে-বলতে মিথ্যা বলাটা অভ্যাস হয়ে যায়। কিন্তু তা তো আর যোগের সাধন নয়! তাই যে-অভ্যাস বৈরাগ্যমূল, তা-ই হল যোগানুকূল।

যোগের প্রধান লক্ষণই হল—অন্তর্মুখ, আত্মস্বরূপে চিত্তের অবস্থান। কিন্তু চিত্ত স্বভাবতই বহির্মুখ, বাইরের টানে বিষয়ের তৃষ্ণায় বারবার সে বাইরেই ছুটছে। যদি ওই বিষয়তৃষ্ণা দূর করতে পারি, তবে তা-ই হবে বৈরাগ্য।

বিষয় আবার দুরকম। এক হল বস্তুর আশ্রিত, আর হল ভাবের আশ্রিত। পতঞ্জলি একটিকে বলছেন দৃষ্ট, আরেকটিকে আনুশ্রবিক। দৃষ্ট-বিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। মনও একটি ইন্দ্রিয়। অতএব মানসিক বিষয়ও দৃষ্টির মধ্যে পড়ে। মানুষ ইন্দ্রিয়ভোগ চায়, খ্যাতি-ক্ষমতা, নানারকমের মানসিক তৃপ্তি—এইগুলি চায়। এসবই দৃষ্ট-বিষয়, কেননা এগুলি ইহলোকেও পাওয়া যায়। কিন্তু সে ইহলোকের বিষয়সুখের জের পরলোকেও টানতে চায়; আর তার জন্য স্বর্গ ইত্যাদির কল্পনা করে—সেখানে গিয়ে এখানকার মত বিষয়সুখ ভোগ করবে বলে। এই বিষয়গুলি ভাবের আশ্রিত বা কাল্পনিক। স্বর্গ কেউ দেখেনি, শুনেছে যে স্বর্গ আছে। তাই সে স্বর্গসুখের তৃষ্ণায় নানা ধর্মানুষ্ঠান করে। বৈরাগ্যের অনুশীলন করতে হলে এই দৃষ্ট বা আনুশ্রবিক দুই তৃষ্ণাই ছাড়তে

হবে। চাইতে হবে শুধু আত্মস্বরূপে অবস্থান, আর কিছুই নয়। তার জন্য প্রকৃতির গুণলীলারও উর্ধ্বে চলে যেতে হবে। এটি অবশ্য পরবৈরাগ্য, বৈরাগ্যের শেষ ধাপ।

বৈরাগ্যের মূলকথা যে রাগ বা বিষয়তৃষ্ণা ত্যাগ, এটিকে মনের চঞ্চলতা দূর করবার উপায়রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। বিষয় আমার বাইরে। সে প্রকৃতির অন্তর্গত। প্রকৃতি চঞ্চল, মুহূর্তে-মুহূর্তে তার পরিণাম হচ্ছে। তাই প্রাকৃত বিষয়ের পিছনে ছুটলে মনও চঞ্চল হবে। অতএব প্রাকৃত বিষয়ের প্রতি দুরাগ্রহ আমরা যত কমাতে পারব, মন ততই শান্ত হয়ে আসবে। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'যে অসংযতাত্মা তার যোগ হওয়া বড় কঠিন' (৬।৩৬)।

প্রশ্ন

'শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে' (৬।৪৫) কথাটার তাৎপর্য কি ? 'পৌর্বদেহিকম্'—কথাটিতেই তো গীতায় জন্মান্তরবাদ স্বীকার করা হইয়াছে ?

উত্তর

মীমাংসায় দুরকম ব্রহ্মের কথা আছে—পরব্রহ্ম আর শব্দব্রহ্ম। পরব্রহ্মের লক্ষণ গীতাতেই আছে : 'অক্ষরঃ ব্রহ্ম পরমম্' (৮।৩)—বিশ্বমূল যে-অব্যয়তত্ত্ব, তা-ই হল পরব্রহ্ম। তাঁর বাচক যে শব্দরাশি তা-ই হল—শব্দব্রহ্ম। তা হল বেদ। বেদের সার হল প্রণব বা ওঙ্কার। তাকেও শব্দব্রহ্ম বলা হয়। গীতা এই শব্দব্রহ্মকে স্বীকার করেছেন। বলেছেন, 'ওম্ হচ্ছে একাক্ষর ব্রহ্ম। তা উচ্চারণ করে আমার অনুস্মৃতি নিয়ে দেহ ছেড়ে যে এগিয়ে চলে, সে পায় পরমা গতি (৮।১৩)।' আবার বলেছেন, 'ব্রহ্মের তিনটি মাত্রা—ওম্ তৎ সং।…ব্রহ্মবাদীদের যজ্ঞ, দান ও তপের ক্রিয়া প্রবর্তিত হয় ওম্ উচ্চারণ করে' (১৭।২৩-২৪)। এই শব্দব্রহ্ম পরব্রহ্মের সোপান। কিন্তু বেদে ভোগৈশ্বর্যলাভের উপায়ও নির্দেশ করা হয়েছে। লোকে সেদিকেই বেশী ঝোঁকে, আর বেদবাদরত হয়ে 'এ ছাড়া আর

কিছুই নাই' বলে কোলাহলও করে (২।৪২-৪৩)।' শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, এই বেদ বা শব্দব্রহ্ম 'ত্রৈগুণ্যবিষয়' অর্থাৎ একে আশ্রয় করে গুণের ওপারে যাওয়া যায় না, 'নির্দ্বন্দ্ব নিত্যসত্ত্বস্থ নির্যোগক্ষেম এবং আত্মবান্' হওয়া যায় না (২।৪৫)। এই বেদ দিয়ে কি হবে (২।৪৬)? যে-বেদ দিয়ে আমাকে জানা যায়, সে-বেদের খবর আমিই রাখি, আর কেউ নয় (১৫।১৫)।

এই বেদ বা শব্দব্রহ্ম কি, তা আগেই বলেছি। যোগী যে-শব্দব্রহ্মকে ছাড়িয়ে যান, তা হল ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তদের ওই বেদবাদ (২।৪২-৪৪)।

শব্দব্রহ্মের আরেক নাম শ্রুতি। শ্রীকৃষ্ণ তারও ওপারে যেতে বলেছেন এক জায়গায় : 'যখন তোমার বুদ্ধি মোহের আবর্ত কাটিয়ে উঠতে পারবে, তখন তোমার শ্রোতব্য বা শ্রুতি দুয়ের প্রতিই নির্বেদ এসে যাবে' (২।৫২)। অর্থাৎ 'এই শুনেছি, আরও শুনতে হবে' —এ-দুরাগ্রহ তখন থাকবে না, কেননা, তখন 'একাগ্রচিত্তে তুমি শুনেছ আমার কথাই, যাতে তোমার অজ্ঞান-সম্মোহ নষ্ট হয়ে গেছে' (তুঃ ১৮।৭২)। এমনি করেও যোগী শব্দব্রহ্মকে ছাড়িয়ে যান।

গীতায় কেন, এদেশের সব দর্শনে (কেবল চার্বাকদর্শন ছাড়া) জন্মান্তর স্বীকৃত। তবে তার তাৎপর্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ধোঁয়াটে।

প্রশ্ন

তপস্বী, জ্ঞানী এবং কর্মী অপেক্ষাও যোগীকে অধিক বলা হয়েছে কেন (৬।৪৬-৪৭)? 'শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং'—এই 'মাং' শব্দ দ্বারা কাহাকে বোঝানো হইয়াছে? পরমেশ্বর এবং পুরুষোত্তম-তত্ত্বে কোন ভেদ আছে কি? 'যুক্ততম' শব্দটি প্রয়োগের নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে!

উত্তর

পতঞ্জলিতে তপঃ যোগের একটি বহিরঙ্গ মাত্র, তা নিয়মের অন্তর্গত। শুধু তপস্বী হলেই যোগী হওয়া যায় না। তপঃ

একটা বাহ্য সাধন বলে তার সাত্ত্বিক, রাজসিক আর তামসিক ভেদও আছে (১৭।১৭-১৯)। এর মধ্যে সাত্ত্বিক যে শারীর, বাঙ্ময় আর মানস তপ, তা-ই যোগের প্রকৃষ্ট সাধন (১৭।১৪-১৬)। তবুও তা সাধন মাত্র, সাধ্য নয়।

জ্ঞানের পরিপাক হয় যোগে—এখন জ্ঞানকে তুমি যে অর্থেই নাও। জগৎ-সংসার থেকে উজিয়ে গিয়ে তার জ্ঞান হয়। আর সেই জ্ঞানকে আবার ব্যবহারে অটল রাখতে পারলে তবে যোগ হয়। একথা শ্রীকৃষ্ণ গীতার গোড়াতেই বলেছেন এবং যোগবুদ্ধি যে সাংখ্যবুদ্ধির ব্যবহারিক দিক্, যাতে কর্মবন্ধন ছুটে যায়, যার স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠান আমাদের মহাভয় হতে ত্রাণ করে—এ-কথাও বলেছেন (২।৩৯-৪০)। তাই শুধু জ্ঞানী হলেই হয় না, সেই জ্ঞানকে যদি জীবনে প্রতিফলিত করতে পারি অর্থাৎ যোগীও হতে পারি, তবেই জ্ঞানের সার্থকতা।

কর্মীর চাইতে যোগী যে বড়, একথা বোঝা কঠিন নয়। কর্ম না করে কেউ এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। প্রকৃতির গুণ সবাইকে অবশে কর্ম করিয়ে নিচ্ছে (৩।৫)। তাহলে সবাই তো কর্মী, কিন্তু তারা কি যোগী? তারা কি যোগস্থ হয়ে কর্ম করছে (২।৪৮)? সুতরাং যোগী কর্মীদের চাইতেও বড়।

কিন্তু যোগেরও রসায়ন হচ্ছে—ভক্তি। কর্ম করছি তাঁর জন্য, তপস্যা করছি তাঁর জন্য, জ্ঞানের সাধনা করছি হৃদয় দিয়ে তাঁকে পাবার জন্য। কর্ম, তপ, জ্ঞান সবার লক্ষ্য তিনি, এই হল ভক্তিযোগ—যা সব যোগের শ্রেষ্ঠ, সব যোগের সার্থক পরিণাম। তাই, যে যোগী হয়েও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে ভজনা করে, যাঁর যোগ—আর গীতার আঠারটা অধ্যায়েই তো আঠার রকমের যোগ—তাঁকে পাবার জন্য, সেই তদ্গতচিত্ত ভক্তই যুক্ততম।

'মাং' গীতাতে সর্বত্র পুরুষোত্তমকে বোঝায়, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা (১৫।১৭)।

প্রশ্ন

গীতা 'অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী' 'স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা'। ভাগবতও তো সেই ভগবানের কথা? ভাগবতও কি অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী? গীতার অদ্বৈতে, ভাগবতের অদ্বৈতে—গীতার ভগবানে আর ভাগবতের ভগবানে বিশেষত্ব কিছু আছে কি?

উত্তর

গীতার প্রবক্তা ভগবান্। ভগবান্ এক ছাড়া দুই তো নন। এই যে বহু, এ-ও তিনি। যেমন 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ঔপনিষদ্ অনুভবের সার, তেমনি 'বাসুদেবঃ সর্বম্', এও ভাগবত ধর্মের সার। এটি অদ্বৈতোপলব্ধিরই কথা। একমাত্র তিনিই আছেন, জগৎ নাই—এও এক ধরণের অ-দ্বৈতবোধ। এ-বোধ হয় উত্তার-পথে—যখন তুমি জগৎ হতে উজিয়ে যাও। আবার সেই অদ্বৈতকে নিয়ে জগতে নেমে আস যখন, তখন সবাইকে তাঁরই মাঝে দেখ। তিনি-রূপেই দেখ। তখন বল, সব ব্রহ্ম, সব বাসুদেব। এও অদ্বৈতবাদ। নির্বিশেষ অদ্বৈতের পূর্ণতা এই সবিশেষ অদ্বৈত। আমাদের তর্কবুদ্ধি দুয়ের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করে। কিন্তু ভগবানে তো এ-বিরোধ নাই। গীতাতেও নাই। গীতাতে পূর্ণাদ্বৈতবাদ। তার মহাবাক্য হল—'বাসুদেবঃ সর্বম্।'

এটা ভাগবত ধর্মের একদিক—জ্ঞানের দিক। আরেকদিক ফুটেছে ভাগবতে। সে হল প্রেমের দিক, আনন্দের দিক, আস্বাদনের দিক। ভগবানকে তুমি অর্জুন হয়ে, পুরুষ হয়ে যখন পাও—সমাধিতে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে এবং ব্যুত্থানে তাঁর প্রপন্ন নিমিত্ত হয়ে, তখন তুমি পাও গীতাকে। আবার তাঁকে যখন পাও পুরুষালি বিসর্জন দিয়ে নারী হয়ে, রাধা হয়ে, তাঁর দ্বারা সম্ভুক্ত হয়ে, তখন পাও ভাগবতকে। গীতার জ্ঞান আর ভাগবতের প্রেম—দুইই ফোটাতে হবে জীবনে অর্থাৎ কর্মে অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রে। কুরুক্ষেত্রে কর্ম আছে, তার সাধনা করতে হবে জ্ঞান এবং ভক্তির উপর ভিত্তি করে। এটা যেন দিনের আলোয় ভগবানকে পাওয়া। আর বৃন্দাবনে

আছে প্রেমের মাধুরী—ফুল্ল-মল্লিকা জ্যোছনা রজনীতে ভগবানকে বুক ভরে পাওয়া—গোপী হয়ে।

দুটি মিলিয়ে ভাগবত-ধর্মের পূর্ণতা। আর সেই পূর্ণতার ঘন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ। তুমি তাঁর পরা প্রকৃতি—অর্জুনরূপে কুরুক্ষেত্রে আর গোপীরূপে বৃন্দাবনে।

আমার দৃষ্টি তোমায় দিলাম। এখন তুমি যেমন খুশি দেখ।

প্রশ্ন

গীতার ভক্তিতে আর ভাগবতের ভক্তিতে কিছুটা পার্থক্য আছে। একটু বিশ্লেষণ করিবেন কি ?

উত্তর

ভাগবতে গীতার ভক্তি তো আছেই, অধিকন্তু আছে প্রেমভক্তি। দুয়ে তো বিরোধ নাই। একটা আরেকটারই পরিপাক। শান্ত দাস্য সখ্য—এই পর্যন্ত ভক্তির পূর্বকাণ্ড। বাৎসল্য আর মধুরে উত্তরকাণ্ড। আগেরটি আছে গীতায়, পরেরটি নাই। ভাগবতে সবটাই আছে। গোপীর বাৎসল্যে আর প্রেমে ভগবান অবতার হলেন, জন্ম নিলেন। তাঁর বাল্য আর কৈশোর তো বৈকুণ্ঠে নাই। ভাগবতে কিন্তু একাধারে তাঁর নিত্য-স্বরূপের, আবার এই বাল্য-কৈশোরাশ্রিত লীলা-স্বরূপের বর্ণনা। ভাবটা অবশ্য বেদ থেকেই নেওয়া।

সাধক-সংস্কার যার প্রবল, সে বলবে জ্ঞান-বৈরাগ্য ছাড়া ভক্তি হয় না। সত্যিই তো! বিষয়াসক্তি থাকতে, মোহ থাকতে ভক্তি হবে কি করে? তাতে প্রতি মুহূর্তে যে ভাবের ঘরে চুরি হবে।

আবার, সিদ্ধ সংস্কার যার প্রবল, সে বলবে অতশত বুঝি না, তোমায় ভালবাসি। ভালবাসি বলেই তুমি ছাড়া আর সব বিষ (বৈরাগ্য); আর বুঝি তুমি কী মধু, আমি তোমার কি, তুমিই-বা আমার কি (জ্ঞান)।

প্রশ্ন

গীতা এবং ভাগবত দুটিতে মিলিয়ে ভাগবত-ধর্মের সাধনার সঙ্কেত বা ধারাটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর

সাধনার তিনটি পর্যায়—কর্ম জ্ঞান আর ভক্তি। কর্ম দিয়েই জীবন শুরু, সাধনাও শুরু। কর্ম যখন ধর্ম দ্বারা শাসিত হয়, তখনই তা সাধনাঙ্গ হয়। এটা হল বিধিমার্গের কথা। ধর্মশাসিত কর্মের অনুষ্ঠানেই হল—স্বধর্মাচরণ। এর বিধান আছে স্মৃতিতে। এর মধ্যে ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে। সেটি ছাড়তে পারলে তবে কর্ম-যোগ। তাই কৃষ্ণে কর্মফল অর্পণ করে কাজ করে যাওয়া। তখন ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকলেও বিধি-নিষেধের বোধ থাকতে পারে। ফলাকাঙ্ক্ষাহীনের প্রথম অবস্থা অকর্তা হয়ে কাজ করা। এতে ভিতরটা ফাঁকা হয়ে যায়। তাতে একদিকে যেমন জ্ঞানের উন্মেষ হয় (কেননা জ্ঞান হচ্ছে ঔদাসীন্য, তটস্থভাব বা বিবেক হতে জাত), তেমনি ধর্মাধর্ম বা বিধিনিষেধেরও বাঁধন আর থাকে না। তখন স্বধর্মত্যাগের অবস্থা। এইথেকেই আসে আমি নিমিত্তমাত্র—এই বোধ। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী—এইথেকে তাঁর প্রতি অনুরাগের উন্মেষ হয়। তখন জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অবস্থা। কর্ম তখন যন্ত্রের মত চলছে। ভিতরে জ্ঞানের প্রশান্তি আর তারই দিগন্তে অনুরাগের অরুণিমা।

ক্রমে ওই অরুণিমায় চিত্ত রঞ্জিত হয়ে যায়, আমিত্ববোধের রূপান্তর ঘটতে থাকে। ‘আমি’র জায়গা এসে দখল করে ‘তুমি’। তুমিই আছ, আমি আছি কি নাই সে-খেয়াল আর থাকে না। তখনও কর্ম চলে কিন্তু তা রূপান্তরিত হয় সেবায়। কর্মে রসের প্রকাশ হয়। এই হল জ্ঞানশূন্যা ভক্তি।

ভক্তিতে যে চিত্তে রসের পরিপাক হতে থাকে, তার ফলে আমাকে ‘তোমার’ করে আবার নতুন করে পাই। তার প্রথম অবস্থা হল দাস্যভক্তি—যা প্রেমভক্তির প্রথম ধাপ। দাস্যে তুমি বিরাট,

আমি অণু। সখ্যে তুমি-আমি সমান-সমান। বাৎসল্যে তুমি ছোট, আমি বড়। আমি বড় হই ভালবাসায়। সুতরাং এ অবস্থাগুলি প্রেমভক্তিরই পুষ্টি। অবশেষে কান্তাপ্রেম, যার মধ্যে সমস্ত ভাবের সমাহার। এই প্রেম গোপীপ্রেম। আমি আর তখন পুরুষ নই—পরমা প্রকৃতি। তারও মধ্যে তিনটি স্তর আছে—সাধারণী, সমঞ্জসা আর সমর্থা। সমর্থার চরমে রাধাপ্রেম। ওটি সাধ্যভাবনার অতীত।

॥ সমাপ্ত ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

প্রথম ষট্‌ক

[১ম হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায়]

মূল

গীতাধ্যানম্

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতম্।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্
অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্ ॥ ১
নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥ ২
প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ ॥ ৩
সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৪
বসুদেবসুতং দেবং কংসচানূরমর্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্ ॥ ৫
ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধার-নীলোৎপলা
শল্যগ্রাহবতী কৃপেন বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।
অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্যোধনাবর্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্তকে কেশবে ॥ ৬
পারাশর্যবচঃসরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানককেশরং হরিকথা-সম্বোধনাবোধিতম্।
লোকে সজ্জনষট্পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা
ভূয়াদ্ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে ॥ ৭
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ॥
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ৮
যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতস্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ ৯

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মঙ্গলধ্যানং সমাপ্তম্।

——

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুনবিষাদযোগঃ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।
আচার্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২
পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩
অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬
অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯
অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি ॥ ১১
তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮
স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ॥ ২০
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।

অর্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ॥ ৩৩
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে ॥ ৩৪

নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ॥ ৩৫
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬
যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন ॥ ৩৮
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৩৯
অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২
উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩
অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে অর্জুন-বিষাদযোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

সাংখ্যযোগঃ

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন॥ ২
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ ৩

অর্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন॥ ৪

গুরূনহত্বা হি মহানুভবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপিহলোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্॥ ৫
ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ॥ ৬
কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥ ৭

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১
ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ১২
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি ॥ ১৭
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩
অকীর্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪
ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮
এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯
নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি-বাদিনঃ ॥ ৪২
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩
ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ৪৫
যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ৪৬
কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥ ৪৭
যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ৪৮
দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥ ৪৯
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্॥ ৫০
কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥ ৫১
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ ৫২
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥ ৫৩

অর্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥ ৫৪

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ ৫৫
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ ৫৬
যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৭

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮
বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥ ৫৯
যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০
তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬২
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩
রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪
প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮
যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

কর্মযোগঃ

অর্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১
ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২

শ্রীভগবান উবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩
ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫
কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ॥ ৮
যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৯
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥ ১০
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥ ১১
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥ ১২
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥ ১৩
অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ॥ ১৪
কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৫
এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥ ১৬
যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥ ১৭
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥ ১৮
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥ ১৯
কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি॥ ২০
যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥ ২১

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ॥ ২২
যদি হ্যহং ন বর্তেয় জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২৩
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪
সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮
প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯
ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ ॥ ৩১
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪
শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫

অর্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয়! দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যোবুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো! কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

জ্ঞানযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩

অর্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬
যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮
জন্মকর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥ ৯
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ১১

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা ॥ ১২
চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩
ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫
কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১৬
কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥ ১৭
কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ ১৮
যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯
ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাঽপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥ ২৪
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬
সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ॥ ৩০
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১
এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩
তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪
যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭
নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ ৪০
যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥ ৪১
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥ ৪২

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

সন্ন্যাসযোগঃ

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণপুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে॥ ২
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৩
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥ ৪
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ৫
সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৬

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১
যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২
সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্ ॥ ১৩
ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে ॥ ১৪
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥ ১৬
তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮
ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্‌বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥ ২১
যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ২২
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ২৩
যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥ ২৪
লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥ ২৫
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ২৬
স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥ ২৭
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥ ২৮
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥ ২৯

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

ধ্যানযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ ॥ ১
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্যতে।
সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮
সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯
যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥ ১৬
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা ॥ ২৩
সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ ২৬
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥ ২৭
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ ২৮
সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥ ২৯
যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৩০
সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥ ৩১
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৩২

অর্জুন উবাচ

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥ ৩৩
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ ৩৪

শ্রীভগবানুবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৩৫
অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥ ৩৬

অর্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥ ৩৭

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯

শ্রীভগবানুবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩
পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪
প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫
তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন ॥ ৪৬
যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অভ্যাসযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

পরিশিষ্ট

মূল গ্রন্থের প্রশ্নোত্তরপ্রসঙ্গে উল্লিখিত
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার
প্রথম ষট্কাতিরিক্ত শ্লোকাবলী

পৃষ্ঠা	শ্লোক
২	সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ৯।১৪
৫	যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্। স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ১৮।৪৬
৭	অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ৯।১১
১১	ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া। বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ১৮।৬৩
১৪	সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ। বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫।১৫
১৫	যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ। যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ১৮।৫
১৫	প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব। ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ১৪।২২
২০	যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্। স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ১৮।৪৬

পৃষ্ঠা	শ্লোক
২৬	মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ । সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ১৪।৩
২৬	সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ । তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥১৪।৪
২৬	অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে । ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৮।৩
৩০	অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ত্ততে । ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ১০।৮
৩২	তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ । দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০।১০
৩২	চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ । বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ১৮।৫৭
৩৬	অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে । ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৮।৩
৪১	সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ । বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫।১৫
৪১	যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্ । স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ১৮।৪৬
৪১	সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ । সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ১৮।৪৮
৪১	অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ । নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ১৮।৪৯

পৃষ্ঠা	শ্লোক
৪৪	ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ১৮।৬১
৪৫	অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ১০।৪২
৫৮	মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ১৫।৭
৬০	প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে। বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ১৮।৩০
৬০	বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ। শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ১৮।৫১
৬০	ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ। যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ১৮।৩৩
৬৩	উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৫।১৭
৬৩	যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৫।১৮
৬৪	অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ৯।১১
৬৬	ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্। যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৮।১৩
৬৬	ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ১৭।২৩

পৃষ্ঠা	শ্লোক
৬৬	তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ । প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ১৭।২৪
৬৭	সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ । বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫।১৫
৬৭	কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা । কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ১৮।৭২
৬৮	শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ । অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭।১৭
৬৮	সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ । ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৭।১৮
৬৮	মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ । পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৭।১৯
৬৮	দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্ । ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৭।১৪
৬৮	অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ । স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৭।১৫
৬৮	মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ । ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৭।১৬
৬৮	উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ । যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৫।১৭

শ্রীমৎ অনির্বাণ-রচিত গ্রন্থাবলী

১। শিক্ষা	৩০·০০
২। বেদান্ত-জিজ্ঞাসা	৮·০০
৩। গীতানুবচন ২য়	৪০·০০
৩য়	৪০·০০
৪। প্রবচন (অখণ্ড)	৮০·০০
৫। শ্রীঅরবিন্দের Life Divine-এর অনুবাদ দিব্যজীবন ১ম	নাই
২য়	নাই
৬। যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ	প্রকাশিত নাই
৭। দিব্যজীবন-প্রসঙ্গ	প্রকাশিত নাই
৮। পত্রলেখা ১ম	৫০·০০
২য়	৫০·০০
৩য়	নাই
৯। দক্ষিণামূর্তি	নাই
১০। উপনিষৎ-প্রসঙ্গ ১ম	নাই
২য়	নাই
৩য়	নাই
১১। বেদমীমাংসা ১ম	নাই
২য়	নাই
৩য়	নাই
১২। স্নেহাশিস ১ম	নাই
২য়	নাই
৩য়	নাই
১৩। কাবেরী	নাই
১৪। প্রশ্নোত্তরী	১২·০০
১৫। অন্তর্যোগ	২০·০০
১৬। পথের সাথী ১ম	নাই
২য়	নাই
১৭। সাহিত্য-প্রসঙ্গ	নাই